মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মান (এই তিনটি জিনিসের ক্ষতিসাধন) হারাম’ (মুসলিম হা/২৫৬৪)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০২৫

এই নৃশংসতার শেষ কোথায়?

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٢٨ العدد : ١١ صفر و ربيع الأول ١٤٤٧هـ/ أغسطس ٢٠٢٥م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন’ (বুখারী হা/৪৫০)।

পূর্ণাঙ্গ মসজিদের থ্রিডি ভিউ

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলার কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

নির্মাণাধীন মসজিদ

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ	ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬ দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত (শনিবার, সোমবার ও বুধবার)	শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী ফোন : ০১৭৬২-৬৮৫০৯০, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬ বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)	বাড়ী # ২২৩ ও ২২৪, কাজীহাটা, রাজপাড়া, রাজশাহী ফোন : ০২-০২৫৮৮৮৫৩২২২, ০১৭১৭-৮১৮২৪৪ সিরিয়ালের জন্য হটলাইন : ০৯৬১০০০৯৬৩৬ প্রতি বৃহঃবার বিকাল ৩-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ | ১১তম সংখ্যা

ছফর-রবীঃ আউঃ ১৪৪৭ হি.
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩২ বাং
আগস্ট ২০২৫ খৃ.

| সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
| সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
| সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ *(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - অস্থির সময়ে চাই আদর্শিক দৃঢ়তা ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - কুরআন সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের সংশয় ও তার জবাব *(২য় কিস্তি)* ০৩
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - রিয়া : কারণ ও প্রতিকার ০৭
    -ড. নূরুল ইসলাম
  - তাক্বওয়ার ফযীলত ও গুরুত্ব *(পূর্বপ্রকাশিতের পর)* ১২
    - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - ইলম ও আমলের সমন্বয় ১৬
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- **দিশারী :**
  - আল-কুরআনে আয়াত সংখ্যা : একটি পর্যালোচনা ২১
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
- **প্রচ্ছদ রচনা :**
  - এই নৃশংসতার শেষ কোথায়? ২৬
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **ছাহাবী চরিত :**
  - হুসায়েন বিন আলী (রাঃ) *(শেষ কিস্তি)* ২৮
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - আল-হামরা : হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণযুগের নীরব সাক্ষী ৩২
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - কারিকুলামে প্রতিভার মূল্যায়ন ৩৪
    -সারওয়ার মিছবাহ
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - শিশুদের জন্য স্ক্রিন টাইম ও কন্টেন্ট নির্বাচন ৩৯
    -জাহিদ হাসান
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - সন্তানকে মুছল্লী বানাবেন কিভাবে? ৪১
    - মুহসিন জব্বার
- **কবিতা :** ৪২
  - খেলাফতের ডাক
  - মনের রূপ
  - গণতন্ত্র
  - বাঙ্গালিয়ানা
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

আগস্ট ২০২৫

সম্পাদকীয়

২৮তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

অস্থির সময়ে চাই আদর্শিক দৃঢ়তা

দেশ বর্তমান সময় এক অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পটপরির্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জুলাই'২৪ অভ্যুত্থানের এক বছর পরও সেই কাংখিত নতুন বাংলাদেশ দৃশ্যমান হয়নি। নয়া বন্দোবস্তের বহু শোরগোল শোনা গেলেও পুরোনো বন্দোবস্তের পথেই দেশ এগিয়ে চলেছে। চিরাচরিত নির্বাচন-নির্বাচন আওয়াজের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন। যে গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী মানবতা হরণকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা হিসাবে সুপ্রমাণিত, সেই গণতন্ত্রের বিষ গলধঃকরণ করার প্রস্তুতিই নিচ্ছেন ইসলামী দলগুলির নেতৃবৃন্দ। ক্ষমতার পথে আদর্শ যেন একেবারেই মূল্যহীন। ছলে-বলে-কৌশলে যেকোন মূল্যে সোনার হরিণটা পাবার দুর্নিবার লোভ প্রতিনিয়ত হরণ করছে আমাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও আদর্শিক জবাবদিহিতা। মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে আর নীতি-নৈতিকতার ছাড় দিতে দিতে সবকিছু হারিয়ে আমরা শিকার হচ্ছি চূড়ান্ত আদর্শিক দেউলিয়াত্বের।

অথচ আদর্শের উপর অবিচল থাকা একজন মুমিনের অপরিহার্য দায়িত্ব। দুর্যোগ যতই ঘনীভূত হৌক, পরিস্থিতি যতই প্রতিকুল হৌক, সঙ্গী-সাথী যতই কম হৌক না কেন, আদর্শের উপর টিকে থাকাটাই বিজয়ের সোপান। টোকা-শ্যাওলার মত স্রোতে ভেসে যাওয়াটা মুমিনের কাজ নয়। আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং তুমি (মুহাম্মাদ) এবং তোমার সাথী হয়ে যারা তওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তোমরা যা করছ তিনি সবকিছু দেখেন' *(হূদ ১১/১১২)*। এই আদর্শিক দৃঢ়তাই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামকে বিজয়ী করেছিল। এটি মুমিনের কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি। এই অবিচলতার একটি সাধারণ সূত্র হ'ল যাবতীয় প্রতিকূলতা, প্রলোভন বা হুমকির মুখেও মূলনীতি ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা। যা মুমিনের নৈতিক সাহস, আত্মত্যাগ ও প্রতিরোধের চেতনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই আদর্শিক দৃঢ়তা কেবল একটি বিশ্বাস মাত্র নয়, বরং এটি একটি বৈপ্লবিক শক্তি যা মানুষকে সত্যের পথে অজেয় করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের দিকে সংগঠিত করে। আর এই আদর্শিক দৃঢ়তাই মানুষের মধ্যে একসময় গণসচেতনতা গড়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনে। যেমন মাক্কী জীবনে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে রাসূল (ছাঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা ও নিরন্তর দাওয়াত মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সূচিত করে। যা পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিজয়ের ভিত্তি ছিল। অতএব একমাত্র ঈমানী দৃঢ়তাই বিজয়ের শর্ত, জনগণের ভিড় নয়। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

প্রশ্ন হ'ল, দ্বীন তবে কীভাবে কায়েম হবে, ক্ষমতা মসনদে আরোহণের মাধ্যমে না জনগণের হৃদয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে? প্রথম পন্থাটি হ'ল বর্তমানে কথিত ইসলামী রাজনীতির দাবীদারদের। আর দ্বিতীয়টি হ'ল নবীগণের তরীকার অনুসারী মুমিনদের। নবীগণের তরীকায় একজন মানুষ তাওহীদের পথে ফিরে এলে, ইসলামকে মনেপ্রাণে কবুল করলে তার পুরো জীবনটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে ব্যবসা করলে সূদ-ঘুষ-মওজুদদারী থেকে বিরত হয়। পারিবারিক জীবনে সে হয় একজন আল্লাহভীরু ও সুন্দর চরিত্রের মানুষ। রাজনীতি করলে সে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। এজন্য ইসলামী রাজনীতির নামে আলাদা কোন পরিভাষা চালু করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হ'ল মানুষকে ইসলামের বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রূপটা বুঝানো। অধিকাংশ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা রাখে না। তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য বুঝে না। ইসলামী নেতাদের কর্তব্য ছিল সবার আগে মানুষকে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা। চেতনাহীন ও আদর্শহীন মুসলিম-অমুসলিম এক দল লোকের ভোট নিয়ে ইসলামী আইন চালু করতে গেলে ঐসব ভোটারদের খুশী করতে গিয়েই ইসলাম কায়েম হবে না। তাই ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে জনগণের ঈমানবৃদ্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক। তবেই 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হিসাবে মুসলমানরা তাদের হৃত মর্যাদা ফিরে পাবে। আর শ্রেষ্ঠ উম্মতের বৈশিষ্ট্য হ'ল 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা। আর মা'রূফ ও মুনকার তথা ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যার বুঝ হ'তে হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। পরবর্তী যুগের কোন চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও পীর-মাশায়েখদের বুঝ অনুযায়ী নয়।

এভাবে ব্যক্তির মধ্যে ইসলাম কায়েম হ'লে রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম হবে। তখন যদি ক্ষমতায় অন্য কেউ থাকে, তবুও তারা মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকারকে সম্মান করবে এবং তাদের প্রতি মনোযোগী হবে। এমনকি নাজাশীর মত নিজেরাই ইসলাম কবুল করবে। ইসলামের এই মানবদরদী তরীকা ছেড়ে উগ্র ক্ষমতার লড়াইয়ে বিশৃংখল জীবনপাত করা কোন ইসলামী পথ নয়। নবীগণের পথও নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের ভবিষ্যৎ নবীদের তরীকায় নিহিত। পশ্চিমাদের দেখানো কোন তরীকায় নয়। আমরা মানুষকে সেপথেই আহ্বান জানাই।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ইসলামের জাগতিক স্বার্থে বাতিলের সাথে সাময়িক আপোষ করা যায়, তবে আমরা নযর দেব বিগত ৬০ বছরে মিসর, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও সম্প্রতি মালদ্বীপের গণতন্ত্রের দিকে। এসব দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা একচেটিয়া। এমনকি মিসর, আলজেরিয়া ও পাকিস্তানসহ কতিপয় দেশে কিছু আহলেহাদীছ ও সালাফী সংগঠনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। তারপরও কোন দেশেই কি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের কোন চিত্র ফুটে উঠেছে? বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো প্রতিকূলে যাচ্ছে।

মরক্কোতে ২০০২ সালের নির্বাচনে ৩২৫টি আসনের মধ্যে ৪২টি আসন পেয়েছিল জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট (আদালত) নামক ইসলামিক পার্টি। কিন্তু দেখা গেছে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন বা ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের দাবী না তুলে তুরস্কের মডেলে কেবল গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে। তুরস্কে জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি প্রধান রিসেপ তাইয়েব এরদোয়ান ১৪ই মার্চ ২০০৩ থেকে অদ্যাবধি ক্ষমতাসীন থাকলেও তাদেরও একই দুরবস্থা। মিসরের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসী (৩০শে জুন ২০১২-৩রা জুলাই ২০১৩ খৃ.) এক বছরের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় মৃত্যুবরণের মাধ্যমে মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করেছেন। ক্ষমতায় গিয়েও তিনি ইসলামের কিছুই করতে পারেননি। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটেও কোন রাজনৈতিক ইসলামী সংগঠনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের দাবী করতে দেখা যায়নি। এ সব সংগঠনের নিয়ত হয়তবা সৎ হলেও এবং জনগণ তাদের পক্ষে থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সিস্টেমের ছাঁচে পড়ে তারা তাদের দাবী থেকে পিছু হটে গিয়েছেন।

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

কুরআন সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের সংশয় ও তার জবাব

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(২য় কিস্তি)

৩. কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যের মান :

প্রাচ্যবিদরা কুরআনের সাহিত্যিক মান এবং এর অলৌকিকত্ব (ই'জায) নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। স্কটিশ দার্শনিক থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) কুরআনের সত্যতা স্বীকার করলেও একে ক্লান্তিকর পাঠ (toilsome reading), বিভ্রান্তিকর জগাখিচুড়ি (a wearisome confused jumble), অন্তহীন পুনরাবৃত্তি (endless iterations) এবং অগ্রহণযোগ্য নির্বুদ্ধিতা (insupportable stupidity) হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[১] সালোমন রেইনাখ (Salomon Reinach) এটিকে নিম্ন সাহিত্যিক মানসম্পন্ন (little merit ... from a literary point of view) বলে মন্তব্য করেছেন।[২]

কুরআনের ব্যাকরণগত ত্রুটির অভিযোগও করা হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে। যেমন ইরানী ধর্মত্যাগী মুরতাদ লেখক আলী দাস্তি (Ali Dashti) কুরআনে আরবী ভাষার স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত একশো'র বেশী ভুল রয়েছে বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন অসম্পূর্ণ বাক্য, অপরিচিত শব্দ, লিঙ্গ ও বচনের অসমতার ব্যবহার ইত্যাদি।[৩]

জার্মান প্রাচ্যবিদ গার্ড আর. পুইন (Gerd R. Puin) বলেন যে, 'যদিও কুরআন দাবী করেছে যে, তা *মুবীন* বা সুস্পষ্ট; কিন্তু যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে যে, কুরআনের প্রতি পঞ্চম বাক্য প্রায়শই অর্থহীন এবং সমগ্র কুরআনের এক-পঞ্চমাংশ কেবলই দুর্বোধ্য কিংবা অন্য ভাষায় অনুবাদ অযোগ্য। তাছাড়া অনেক আরবও স্বীকার করবে যে, এতে স্ববিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান'।[৪]

তাদের মতে, কুরআনে এমন অনেক শব্দ রয়েছে যার অর্থ অস্পষ্ট। এছাড়াও কুরআন আরবীতে নাযিল হওয়ার কথা বলা হ'লেও এতে বহু অনারব শব্দ আছে। যেমন ইমাম সুয়ূতী ১০৭টি অনারব বিদেশী শব্দ[৫] এবং আর্থার জেফেরি (Arthur Jeffery) প্রায় ২৭৫টি আরামাইক, হিব্রু, সিরিয়াক, ইথিওপিক, ফার্সি এবং গ্রীক উৎসের শব্দ খুঁজে পেয়েছেন।[৬] এছাড়া তারা কুরআনে বর্ণনার অসঙ্গতি এবং বক্তার পরিবর্তন নিয়েও সমালোচনা তুলেছেন। যেমন, সূরা ফাতিহা একটি প্রার্থনা, যা আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত। কিন্তু দাস্তির বক্তব্য হ'ল, আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত বাক্য স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক উচ্চারিত হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।[৭]

জবাব :

প্রথমতঃ কুরআন আরবী ভাষার চূড়ান্ত উৎকর্ষের প্রতীক। আরব কবিরাও এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারেনি। কুরআন নিজেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছে, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ 'তারা বলে, এটি তিনি নিজের মনগড়া বলেছেন। বল, তাহ'লে এর মতো একটি সূরা আনো'..(*ইউনুস ১০/৩৮*)। আল্লাহ আরো বলেন, قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 'যদি মানুষ ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়' *(ইসরা ১৭/৮৮)*।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন সামগ্রিকভাবেই অলৌকিকতার একটি প্রমাণ। ভাষা ও সাহিত্যগত দিক থেকে এটি কেবল শব্দ বা বাক্য গঠন নয় বরং এর সুর, তাল, সংক্ষিপ্ততা সবকিছুই এর অলৌকিকত্বের প্রমাণ বহন করে। কুরআনের এই বৈশিষ্ট্যগত বহুমুখিতা প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিসীমার বাইরে। এজন্য তারা বিচ্ছিন্নভাবে কেবল সংশয়ের বুদবুদ ছড়ায়। তবে কখনই তারা সত্যকে পাশ কাটাতে পারে না। তাদের কতিপয় অর্বাচীন যখন কুরআনের ভাষাকে দুর্বোধ্য বা অর্থহীন মনে করে, তখন আরবরা তো বটেই, বহু অমুসলিম প্রাচ্যবিদও কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্যে এতটাই বিমুগ্ধ হয়েছেন যে তারা বলেছেন, পৃথিবীর সকল সাহিত্যমানকে কুরআন দিয়ে বিচার করা উচিৎ। যেমন ড. উইলিয়াম নাসাউ লিস (Dr. William Nassau Lees) বলেন, 'কুরআনের ভাষা কেবল মনোমুগ্ধকর নয় বরং অতীব সুন্দর। এটি খুবই শক্তিশালী ও গভীর অভিব্যক্তিপূর্ণ। কিছু কিছু স্থানে ভাষা অত্যন্ত উচ্চমানের। যেখানে আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে, তা এককথায় অতুলনীয়। কুরআনের ভাষা সর্বোচ্চ সৌন্দর্যময়, সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও এর গঠনশৈলী তুলনারহিত। কুরআনের ভাষা ও গঠন এমন এক মাপকাঠি, যার আলোকে সকল সাহিত্য রচনা বিচার করা উচিত (The Holy Quran is the touchstone by which every composition is tried)'।[৮] বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও আরবী সাহিত্য গবেষক এ.জে আরবেরী খুব চমৎকার করেই বলেছেন, 'যদি প্রকৃত সত্য স্বীকার করে নেয়া হয়, তবে কুরআনে যে বিষয়বস্তু ও

১. Thomas Carlyle (1841), *On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History*, p. 64-67.
২. Reinach, Salomon (1909), *Orpheus: A History of Religions*.
৩. Dashti, Ali (1994). *Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*, 1994: p. 4.
৪. Dashti, Ali (1994). *Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*, 1994: p. 4.
৫. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন* (কায়রো : আল-হায়আতুল মিছরিয়াহ, ১৯৭৪), পৃ. ২/১২৫-৪৩।
৬. Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Koran, Baroda, 1938.
৭. Dashti, Ali (1994). *Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad*, 1994: p.106,109.
৮. M.M.Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Imam Muhammad Islamic University, Riyadh, 1988, Vol.II, Chapter VII.

মনের ভাবের আকস্মিক ওঠানামা দেখা যায় (যার প্রবাহিত বাগ্মিতার সমুদ্রকে মাপতে উৎসুক সমালোচকরা বিভ্রান্ত হয়), তা আর কোন দুর্বোধ্যতা বা জটিলতা তৈরি করবে না। সত্যি বলতে সমালোচকদের 'সারবত্তাহীন বিশ্লেষণের খাঁচা' দিয়ে কুরআনের এই মহাসমুদ্র মাপার চেষ্টাই অর্থহীন'।[৯]

মূলতঃ কুরআনের চমৎকার বিন্যাস ও আন্তঃসজ্জা প্রকৃতঅর্থে তারাই উপলব্ধি করতে পারে, যারা আরবী সাহিত্যের প্রকৃত মান ও ধারা বোঝে। ফলে কুরাইশরা মুহাম্মাদ (ছা.)-এর সমালোচনায় লিপ্ত হ'লেও ভাষাগত অলৌকিকত্বকে অস্বীকার করতে পারেনি এবং কুরআনের চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেনি। কেননা তারা স্পষ্টই অনুধাবন করেছিল যে, এই ভাষা কখনও মানুষের হ'তে পারে না।

তৃতীয়তঃ আরবী গদ্যকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটি হ'ল ছন্দবদ্ধ গদ্য (سجع) এবং অপরটি হ'ল সরল ও সাধারণ গদ্য (مرسل)। কিন্তু কুরআন 'গদ্যও নয়, কবিতাও নয়, বরং উভয়ের এক অনন্য সংমিশ্রণ (for the Koran is neither prose nor poetry, but a unique fusion of both)।[১০] এটি সরল গদ্য নয়, কারণ এতে ছন্দ, সুর এবং অনন্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আবার এটি ছন্দও নয়। এভাবে কুরআন এক বিস্ময়কর ছন্দময় ও অছন্দময় শৈলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ। কুরআনের এই সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য পুরো কুরআনে বিস্তৃত। এটি প্রচলিত কাব্যিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে না, বরং একটি প্রাকৃতিক, সংক্ষিপ্ত ছন্দবদ্ধ বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে গঠিত, যা এটিকে কাব্যিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখে এবং একই সাথে গদ্যের চেয়েও বেশী সাবলীলতা ধারণ করে। এছাড়া কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে একজাতীয় ছন্দ (mono-rhyme)। একটি গবেষণায় দেখা যায়, কুরআনের অর্ধেকেরও বেশী আয়াত একই অক্ষরে শেষ হয়। এই অসাধারণ ছন্দবিন্যাস অনুকরণ করা সম্ভব নয়।[১১]

রুম্মানী এবং ডেভিন জে. স্টুয়ার্ট উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের ভাষা শব্দার্থগতভাবে (semantically oriented) সুবিন্যস্ত, এমনকি যেখানে প্রচলিত ছন্দের অভাব দেখা যায় সেখানেও। এতে প্রমাণিত হয় যে, মূলত ছন্দ নয়, বরং অর্থের গভীরতার উপর ভিত্তি করে কুরআনের শব্দচয়ন করা হয়েছে।[১২]

কোন ভাষাতে Palindrome (উল্টোরূপে একই রকমভাবে পড়া যায় এমন শব্দ বা বাক্য) একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হিসাবে গণ্য হয়, যা কবিতার ছন্দ বিন্যাস ও রচয়িতার উৎকর্ষতা এবং নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে। কুরআনেও দু'টি আয়াতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন– (১) ربك فَكَبِّرْ (প্যালিনড্রোমিক বিন্যাস– ر ب ك ف ك ب ر), *(আল-মুদ্দাছছির, ৩)*। (২) كُلٌّ فِي فَلَكٍ (প্যালিনড্রোমিক বিন্যাস– ك ل ف ي ف ل ك), *(আল-আম্বিয়া ২১/৩৩)*। কুরআনে এই প্যালিনড্রোমের অস্তিত্ব কুরআনের অনন্যতা ও ভাষার সমৃদ্ধিকে আরও গভীরভাবে প্রকাশ করে, যা পাঠকের ঈমান বৃদ্ধি করে।[১৩]

চতুর্থতঃ প্রাচ্যবিদরা কুরআনের কিছু নির্দিষ্ট আয়াতের দিকে আঙুল তোলেন যেখানে তাদের মতে, শব্দের বচন (একবচন/বহুবচন), লিঙ্গ (পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ) অথবা ই'রাব (শব্দের শেষাংশের পরিবর্তন যা তার ব্যাকরণগত অবস্থা নির্দেশ করে) প্রচলিত আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী হয়নি। যেমন– সূরা মায়িদার ৬৯নং আয়াত (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى) নিয়ে সংশয় উত্থাপন করা হয়। إِنَّ (ইন্না) যা তার পরের শব্দকে 'নছব' (কর্মকারক) দেয়, কিন্তু এখানে الصَّابِئُونَ (আছ-ছাবিউন) শব্দটি 'নছব' (কর্মকারক)-এর পরিবর্তে 'রফা' (কর্তাকারক) অবস্থায় রয়েছে।

এর জবাবে বলা যায় যে, যেগুলোকে প্রাচ্যবিদরা 'ব্যাকরণগত ভুল' বলে দাবী করেন, সেগুলো আসলে আরবী ভাষার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক শৈলী, বিশেষ অলঙ্কারিক ব্যবহার বা গভীর অর্থবহনকারী ব্যতিক্রমী প্রয়োগ। আরবী ভাষায় এমন অনেক ব্যাকরণগত কাঠামো রয়েছে যা প্রচলিত সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে বিশেষ অর্থ বা তাকীদ প্রকাশ করে। যেমন উপরোল্লিখিত উদাহরণে الصَّابِئُونَ শব্দটি 'রফা' (কর্তাকারক) অবস্থায় আসার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন ابتداء বা নতুন বাক্যের শুরু। অর্থাৎ এই বাক্যে الصَّابِئُونَ নতুন বাক্যের مبتدأ (উদ্দেশ্য) হিসাবে কাজ করছে, যার خبر (বিধেয়) উহ্য রয়েছে। এই ধরনের বাক্য শৈলী আরবী সাহিত্যে কোন বিষয়ের প্রতি পাঠক বা শ্রোতার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।[১৪] কিন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে কিংবা আরবী ভাষাভাষী না হওয়ায় প্রাচ্যবিদরা তা ব্যাকরণগত ভুল মনে করেছে।

মূলত কুরআনে ব্যাকরণগত ভুল থাকার দাবীটাই অবান্তর। কেননা কুরআনই আরবী ব্যাকরণের ভিত্তি। কুরআনের পূর্বে আরবী ব্যাকরণের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-কানূন (নাহু ও ছরফ) কুরআনকে সঠিকভাবে বোঝা ও তেলাওয়াত করার জন্যই প্রণীত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের

---

৯. A.J. Arberry. *The Koran Interpreted, The World's Classics*, Oxford University Press, 1983, Introduction. P.XI.

১০. A.J. Arberry. *The Koran Interpreted, The World's Classics*, P.X.

১১. Devin J. Stewart, *Saj' in the Qur'an, Prosody and Structure*, P.102

১২. আলী বিন ঈসা আর-রুম্মানী, *ছালাছা রাসায়েল ই'জাযিল কুরআন* (কায়রো : ১৯৫৬), পৃ. ৯৭-৯৮।

১৩. Thonthowi and others, *I'jaz Al-Quran in Linguistic Perspective and it's Impact on The Readers*, Insyirah: Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Studi Islam, Vol. 7, No. 1, June 2024, p. 128.

১৪. আবুল কাসেম আয-যামাখশারী, *তাফসীরুল আল-কাশ্শাফ* (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭হি.), পৃ. ১/৬৬০।

প্রতিষ্ঠাতাগণ যেমন আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী (১৬-৬৯হি.), আল-খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহীদী (১০০-১৭৩হি.), সিবাওয়েহ (১৪৮-১৮০ হি.) প্রমুখ কুরআনের ভাষা বিশ্লেষণ করেই আরবী ব্যাকরণের নিয়মগুলো তৈরী করেছেন। তারা কুরআনকে ব্যাকরণের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কুরআনকে ব্যাকরণ দিয়ে বিচার করেননি।

তাছাড়া কুরআনের ভাষাগত অলৌকিকত্বের একটি দিক হ'ল, এর ভাষা সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ বা নিয়ম-কানূনকে অনুসরণ করে। তবে কিছু ক্ষেত্রে এমন ব্যতিক্রমী ও উচ্চাঙ্গের প্রয়োগ দেখা যায় যা মানুষের পক্ষে তৈরি করা অসম্ভব। এটি বরং প্রমাণ করে যে কুরআন কোন মানুষের রচনা নয়, বরং আল্লাহ্রই কালাম।

পঞ্চমতঃ কুরআনে অনারব শব্দ যা ব্যবহৃত হয়েছে, তা মূলতঃ আরবীকৃত হয়েছে এবং আরবী ভাষারই অংশ হয়ে গেছে। আর এটাই প্রতিটি ভাষার স্বাভাবিক ইতিহাস যে কালের বিবর্তনে তাতে অনিবার্যভাবে অন্য ভাষার শব্দ সন্নিবেশিত হয়। এটা ভাষার দুর্বলতা নয় বরং সমৃদ্ধির পরিচায়ক। সুতরাং কোন শব্দ আরবী ভাষায় গৃহীত হওয়ার পর তা আর অনারব বলা যায় না। তবে অনারব উৎস থেকে গৃহীত হওয়ায় একে 'মুআর্রাব' (আরবীকৃত) বলা হয়। যেমন ইমাম সুয়ূতী অধ্যায় রচনা করেছেন, الْمُهَذَّبَ فِيمَا وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْمُعَرَّبِ– (কুরআনে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের সংকলন) এবং বলেছেন, 'কুরআনে কিছু শব্দ অন্য ভাষা থেকে এলেও সেগুলো এতটাই আরবীকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, সেগুলোকে আর অনারব বলা যায় না।'[১৫]

এর আরও দলীল হ'ল, কুরআনে ব্যবহৃত অনারব শব্দগুলো আরবদের কাছে মোটেও অপরিচিত ছিল না। তারা এসবের অর্থ জানত বলে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ তুলেনি। যদি এ বিষয়টি আসলেই সমালোচনার যোগ্য হ'ত তবে তৎকালীন কাফের আরবরা কিংবা রোমান ও পারসিকরা নিশ্চিতভাবে চ্যালেঞ্জ করত। কিন্তু তাদের এমন কোন চ্যালেঞ্জ না করাই প্রমাণ করে যে, কুরআন সত্যিই বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় নাযিলকৃত।[১৬]

মূলতঃ আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রাচীন সেমিটিক ভাষা। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে যেকোন ভাষাই অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে। প্রাক-ইসলামী যুগেও আরব বণিকরা বিভিন্ন সভ্যতার সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কারণে অন্য ভাষার শব্দ আরবীতে ব্যবহার করত। এই শব্দগুলো আরবের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং আরবী ভাষার অংশ হয়ে গিয়েছিল। আর কুরআন তার সামগ্রিক কাঠামো, ব্যাকরণ, বাক্যবিন্যাস এবং শৈলীতে সম্পূর্ণ আরবী এবং এই কারণেই এটিকে 'আরবী কুরআন' বলা হয়েছে।[১৭]

ষষ্ঠতঃ বর্ণনার অসঙ্গতি এবং বক্তার পরিবর্তন নিয়ে যে সমলোচনা করা হয়েছে, তা প্রাচ্যবিদদের আরবী ভাষার ব্যাপারে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা আরবী সাহিত্যের একটি শাখা হ'ল বালাগাত বা অলঙ্কারশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের একটি বিষয়বস্তু হ'ল 'দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন' (التفات) নামক একটি কার্যকর ভাষাশৈলী, যা কুরআনে হরহামেশা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে একটি বাক্যে বক্তব্য প্রদানকালে হঠাৎ করে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে, এক কাল থেকে অন্য কালে বা এক সংখ্যার রূপ থেকে অন্য সংখ্যায় পরিবর্তন আনা হয়, যাতে বক্তব্যে অলংকার, শৈল্পিকতা ও গুরুত্ব বাড়ে। যেমন সূরা ফাতিহার প্রথম তিন আয়াতে তৃতীয় পুরুষে বলা হয়েছে, হঠাৎ চতুর্থ আয়াতে দ্বিতীয় পুরুষে চলে যাওয়া হয়েছে। এটাই التفات। এই পরিবর্তনের কারণে বক্তা বা সম্বোধিতের পুরুষ, সংখ্যা, কাল বা কারকের পরিবর্তন হ'তে পারে, যা অর্থকে আরও শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করে তোলে এবং শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে।[১৮] সুতরাং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয়।

সপ্তমতঃ নোলডেকের মতে, কুরআনে বর্ণিত গল্পগুলো খুব সংক্ষিপ্ত এবং এতে বর্ণনার ধারাবাহিকতা (steady advance in narration) রক্ষা করা হয়নি।[১৯] কুরআনে বর্ণিত কাহিনীসমূহে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য এড়িয়ে চলা হয়েছে, যা কুরআনের অন্যতম বিশেষত্বও বটে। এর কারণ সম্পর্কে শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন, هي أن العامة من الناس عندما يسمعون حكاية غريبة أو قصة كاملة بجميع خصوصياتها وفصولها، فإن طباعهم تميل إلى نفس القصة وتولع بها، ويفوت الغرض الأساسي – وهو التذكير – من بيان القصة الذي يهدف إليه القرآن الكريم. 'সাধারণ মানুষ যখন কোন আশ্চর্য ঘটনা বা কোন কাহিনী তার সব খুঁটিনাটি ও অধ্যায়সহ শোনে, তখন তারা কেবল সেই কাহিনীর প্রতিই আকৃষ্ট হয় এবং তাতেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে কুরআনের কাহিনী বর্ণনার যে মূল উদ্দেশ্য তথা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ, তা তাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়'।[২০] সুতরাং এ বিষয়ে সমালোচনার অবকাশ নেই।

আবার কুরআনে কখনও একই গল্প বেশ কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে। এর পিছনেও বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন- (১) প্রতিবার কিছু অতিরিক্ত বিবরণ যোগ করা, যা আগের আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল না। যেমন সূরা হিজরে হযরত

১৫. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন* (কায়রো : আল-হায়আতুল মিছরিয়াহ, ১৯৭৪), পৃ. ২/১২৫।
১৬. মুহাম্মাদ শা'রাভী, *তাফসীরুশ শা'রাভী* (১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১১/৬৮২৫।
১৭. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ৭/১৪৭।
১৮. M A S Abdel Haleem, *Grammatical Shift For The Rhetorical Purposes: Iltifāt And Related Features In The Qur'ān*, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1992, Volume LV, Part 3.
১৯. Noldeke's essay on the Koran in the *Encylopedia Britannica*, 9th Edition , Vol.16, P. 1891.
২০. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, *আল-ফাউযুল কাবীর ফী তাফসীরল কুরআন* (কায়রো : দারুছ ছাহওয়াহ, ১৯৮৪), পৃ. ৬৬।

আদম (আ.)-এর সৃষ্টির উৎসকে ‘কর্দম থেকে তৈরী শুকনো ঠনঠনে মাটি’ (مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) বলা হয়েছে, যা সূরা আ’রাফে বর্ণিত হয়নি। (২) কখনো গল্পটি যেই প্রসঙ্গে এসেছে, সেখানে আলাদাভাবে কোন দিক তুলে ধরা হয়, যা অন্য কোন জায়গায় প্রাসঙ্গিক ছিল না। (৩) একই অর্থে ভিন্ন ভিন্ন রচনাশৈলীতে উপস্থাপন করার বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখানো। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর যুগে আশ্চর্য হ’ত যে, কীভাবে একই কাহিনী নানা রূপে, ভিন্ন ভিন্ন শব্দে এবং গঠনে উপস্থাপন করা হচ্ছে! আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেন—এ আশ্চর্যজনক বিষয়টি কেবল মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকেই হ’তে পারে, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (৪) নতুনভাবে উপস্থাপন কোন গল্প শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনোযোগ ধরে রাখে এবং তার মধ্যে নতুন ভাবনার খোরাক যোগায়।[২১]

অষ্টমতঃ কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে কিছু الحروف المقطعة (বিচ্ছিন্ন অক্ষর, যেমন- আলিফ-লাম-মীম, ইয়া-সীন, হা-মীম) দেখা যায়, যাদের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। প্রাচ্যবিদরা এই শব্দগুলোর অস্পষ্টতাকে কেন্দ্র করে সংশয় সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে কুরআনে কিছু মুতাশাবিহাত (রূপক বা দ্ব্যর্থবোধক) আয়াত আছে, যার অর্থ স্পষ্ট নয় বা একাধিক অর্থ হ’তে পারে। এছাড়া কুরআনে কিছু এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রচলিত আরবী ভাষায় খুব একটা ব্যবহৃত হয় না বা তৎকালীন আরবের বিভিন্ন গোত্রীয় উপভাষায় প্রচলিত ছিল। প্রাচ্যবিদরা এই শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে না পেরে সেগুলোকে অস্পষ্ট বা অর্থহীন বলে দাবী করেন। তাদের এসকল সংশয়ের জবাবে বলা যায়- (১) الحروف المقطعة (বিচ্ছিন্ন অক্ষর) গুলো মানবজাতির জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহ্র সীমাহীন জ্ঞানের একটি প্রমাণ। এই অক্ষরগুলো দ্বারা আল্লাহ আরবের কবি ও সাহিত্যিকদের যেন চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, তোমরা যে ভাষার অক্ষরগুলো ব্যবহার করে কবিতা ও সাহিত্য রচনা করো, সেই একই অক্ষরগুলো দিয়ে আমি এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়। এটি কুরআনের অলৌকিকত্বের (إعجاز) -এর একটি দিক। (২) সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতে উল্লেখই করা হয়েছে যে, কুরআনে محكمات (সুস্পষ্ট) এবং متشابهات (অস্পষ্ট) উভয় প্রকার আয়াত রয়েছে। মুহকামাত আয়াতগুলো কুরআনের মূল ভিত্তি, আর মুতাশাবিহাত আয়াতগুলো একাধারে নিগূঢ় প্রজ্ঞা এবং পরীক্ষা বহন করে। কেননা এই আয়াতগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঈমানের একটি পরীক্ষা। বিশ্বাসীগণ এগুলোর অর্থ পুরোপুরি না বুঝলেও আল্লাহ্র উপর ঈমান আনেন এবং বিশ্বাস করেন যে এর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে।

(৩) ভাষার নিয়মাবলী সব সময়ই পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাষার প্রয়োগে পার্থক্য থাকে। প্রাক-ইসলামী আরবী ভাষা ও কবিতাগুলোতেও বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষার (dialects) প্রভাব ছিল। কুরআন এসব উপভাষার শ্রেষ্ঠ অংশগুলো একত্রিত করে একটি অনন্য ভাষাশৈলী উপস্থাপন করেছে। সুতরাং কোন শব্দ কারো কাছে অস্পষ্ট হওয়াটা কুরআনের দুর্বলতা নয় (৪) কুরআনে কিছু এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রচলিত আরবী ভাষায় খুব একটা ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু তৎকালীন আরবের বিভিন্ন গোত্রীয় উপভাষায় প্রচলিত ছিল। আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এর শব্দভাণ্ডার বিশাল হওয়ায় একই শব্দের একাধিক অর্থ থাকা বা বিভিন্ন গোত্রীয় উপভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হওয়া ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এটি ভাষার দুর্বলতা নয়; বরং এর গভীরতা ও সমৃদ্ধিই নির্দেশ করে। প্রাচ্যবিদরা এই শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে না পেরে সেগুলোকে অস্পষ্ট বা অর্থহীন বলে দাবী করেন। (৫) কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা সব যুগের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তাই এর কিছু দিক আপাতঃ অস্পষ্ট মনে হ’লেও সময়ের সাথে সাথে আরো স্পষ্ট হয়। তাছাড়া কুরআনের কিছু আয়াত মানুষের জন্য গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে কুরআনের সেই সব আয়াতের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে, যা পূর্বে অস্পষ্ট মনে হ’লেও এখন স্পষ্ট হচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

২১. বাদরুদ্দীন আয-যিরাকশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, ১৯৫৭), পৃ. ৩/২৬-২৭।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

রিয়া : কারণ ও প্রতিকার

-ড. নূরুল ইসলাম

রিয়া মানব চরিত্রের এক নিকৃষ্ট স্বভাব। আধুনিক আরবী সাহিত্যিক সাইয়েদ আহমাদ আল-হাশেমী বলেন, الرياء خصلة ذميمة تدعو إلى النفاق وسوء الأخلاق، ورداءة التمويه والخداع، 'মুনাফেকী, অসৎ চরিত্র, নিকৃষ্ট ধোঁকা ও প্রতারণার দিকে আহ্বানকারী এক নিন্দনীয় স্বভাব হ'ল রিয়া'।[১] অত্যন্ত সন্তর্পণে এটি মানবহৃদয়ে প্রবেশ করে। মানুষ মূলত: তিনটি কারণে এ মনোব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এছাড়া আরো প্রাসঙ্গিক কিছু কারণেও মানুষ রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে রিয়া-র কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

রিয়া-র কারণ সমূহ :

১. প্রশংসাপ্রেম :

প্রশংসা লাভের মনোবাসনা মানুষের স্বভাবজাত। ভালো-মন্দ, যোগ্য-অযোগ্য সবাই প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে। প্রশংসাবৃষ্টিতে ভিজতে চায় না এমন মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুরূহ। কবির ভাষায়-

يَهْوَى الثَّنَاءَ مُبَرِّزٌ وَمُقَصِّرٌ * حُبُّ الثَّنَاءِ طَبِيعَةُ الْإِنْسَانِ–

'শ্রেষ্ঠ ও ব্যর্থ সবাই প্রশংসা পছন্দ করে। প্রশংসাপ্রেম মানুষের স্বভাবজাত'। এজন্য প্রশংসাপ্রেমকে বিদ্বানগণ রিয়ার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[২] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেছেন, أَصْلُ الرِّيَاءِ حُبُّ الْمَحْمَدَةِ 'রিয়ার মূল কারণ হল, প্রশংসাপ্রীতি'।[৩]

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শাসকগোষ্ঠী সবসময় মানুষের নিকট থেকে আত্মপ্রশংসা শুনতে লালায়িত থাকে। তাদের কাজের প্রশংসা না করা হ'লে তারা অধীনস্তদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন; এমনকি তারা তাদের নিপীড়ন ও ক্রোধের শিকার হন। এইসব নেতারা মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য নিজেদের কিছু ভালো কাজ জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। এটা এক ধরনের প্রতারণা।[৪] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'যেসব লোকেরা তাদের কৃতকর্মে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি, এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়, তুমি ভেব না যে, তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব' *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*। জগদ্বিখ্যাত মুফাস্সির হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يُعْطَوا، 'এর মাধ্যমে লৌকিকতা প্রদর্শনকারী ঐ সকল মানুষ উদ্দেশ্য, তাদেরকে যা দেয়া হয়নি তা বেশী দেয়া হয়েছে বলে যারা দাবী করে'।[৫] যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلَّةً 'যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যা দাবী করল, তা তার সম্পদের হ্রাসকেই বৃদ্ধি করে দিবে'।[৬] তিনি আরো বলেন, الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ 'যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারণার জন্য দু'প্রস্থ মিথ্যার পোষাক পরিধান করল'।[৭]

বিভিন্ন মজলিসে আজকাল আত্মপ্রশংসা, লৌকিকতা ও গর্বের প্রবণতা বেড়ে গেছে। লোকেরা গর্ব ও অহংকার করে তাদের কীর্তিগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরছে। কেউ কোন মসজিদ নির্মাণ করলে সে কিভাবে কাজটি শুরু করেছিল, নির্মাণ সম্পন্ন করতে কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, কিভাবে সেসব প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে মসজিদ নির্মাণে সে সফল হয়েছে, সেসব কাহিনী গর্বভরে মানুষকে বলে বেড়াচ্ছে। আবার কোন দানশীল ব্যক্তি কিভাবে ইয়াতীম-অসহায়দের কাছে রোদ-বৃষ্টিতে ঘেমে নেয়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সাহায্য পৌঁছিয়ে দিয়েছে সেসব গল্প মানুষকে শুনাচ্ছে। আবার কোন কোন দাঈকে দেখা যায়, তিনি কত কষ্ট স্বীকার করে আল্লাহ্র পথে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, কত বই বিতরণ করেছেন, দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দিতে গিয়ে কত নির্ঘুম রাত তাকে কাটাতে হয়েছে, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জ্বালায় তিনি অতিষ্ঠ ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বেড়ান। উদ্দেশ্য হল, মানুষের কাছে তার এসব কীর্তি তুলে ধরে তাদের প্রশংসা লাভ করা।

মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল মালেক আল-কাসেম বলেন, وهكذا يكون اللسان في كثير من المجالس وبالا على صاحبه 'এভাবে অনেক মজলিসে জিহ্বা মানুষের জন্য বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে'।[৮] অথচ আল্লাহ বলছেন, 'অতএব তোমরা আত্মপ্রসংসা করো না। তিনি সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহকে ভয় করে' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

---

১. *সাইয়েদ আহমাদ আল-হাশেমী, দীওয়ানুল ইনশা (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আছরিইয়াহ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২।*

২. *আল-হারিছ আল-মুহাসিবী, আর-রি'আয়াতু লি হুকূকিল্লাহ, তাহকীক : আব্দুল কাদের আহমাদ আতা (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ, তাবি), পৃ. ১৬৯; ইবনু কুদামা মাকদেসী, মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২২।*

৩. *ইবনু আবিদ দুনয়া, কিতাবুল আওলিয়া ১/৬৯।*

৪. *সালীম আল-হেলালী, আর-রিয়া, পৃ. ২৬।*

৫. *তাফসীর ইবনে কাছীর ২/২০১।*

৬. *মুসলিম হা/১১০, 'ঈমান' অধ্যায়।*

৭. *বুখারী হা/৫২১৯; মুসলিম হা/২১২৯।*

৮. *মিফতাহু দাওয়াতির রুসুল, পৃ. ২০-২১।*

২. মানুষের নিন্দা ও সমালোচনার ভয় :

মানুষের বিশেষ করে সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবের সমালোচনা ও নিন্দার ভয় রিয়ার অন্যতম কারণ। এদের সমালোচনার বিষাক্ত তীর থেকে বাঁচার জন্য সে নিজেকে তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করে যা তাদেরকে সন্তুষ্ট করে এবং তাদের সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেয়। আর গোপনে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ-হারাম কাজে লিপ্ত হয়।[৯] মহান আল্লাহ বলেন, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا 'তারা লোকদের থেকে লুকাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ থেকে লুকাতে চায় না। তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রিতে তারা (আল্লাহ্র) অপ্রিয় বাক্যে শলা-পরামর্শ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মকে বেষ্টন করে আছেন' *(নিসা ৪/১০৮)*।

এ বিপরীতধর্মী প্রবণতাই মানুষকে রিয়ার পথে ধাবিত করে এবং তার ধ্বংস ডেকে আনে। ইবনু কুদামা মাকদেসী বলেছেন, واعلم: أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضى الناس، رجاء المدح، وخوفاً من الذم، وذلك من المهلكات، فوجبت معالجته، 'জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই অধিকাংশ লোক মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে এবং তাদের প্রশংসা লাভের বাসনায় ধ্বংস হয়েছে। প্রশংসা লাভের আশায় এবং নিন্দার ভয়ে তাদের চলাফেরা-উঠাবসা সবকিছুই মানুষের মর্যিমাফিক হয়ে থাকে। আর এটি ধ্বংসকারী বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অবশ্যই এর চিকিৎসা প্রয়োজন'।[১০]

হামদূন আল-কাস্সারকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আমাদের কথার চেয়ে সালাফ বা পূর্বসূরী বিদ্বানদের কথা বেশী উপকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী হওয়ার কারণ কি'? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'তাঁরা কথা বলতেন দ্বীনের স্বার্থে, ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, পরকালে নিজেদের মুক্তির লক্ষ্যে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য'। وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَقَبُولِ الْخَلْقِ، 'আর আমরা কথা বলি নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি, দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধি এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য'।[১১] এজন্য হুসাইন বিন যিয়াদ বলেছেন, إِذَا جَلَسْتَ فَتَكَلَّمْتَ وَلَمْ تُبَالِ مَنْ ذَمَّكَ وَمَنْ مَدَحَكَ مِنَ اللهِ فَتَكَلَّمَ 'কারো প্রশংসা ও নিন্দার তোয়াক্কা না করে যখন আপনি মজলিসে কথা বলেন, তখনই আপনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কথা বলেন'।[১২]

৩. মান-মর্যাদার লোভ :

ইবনু কুদামা মাকদেসী বলেন, اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، 'জেনে রাখুন! সম্মান-মর্যাদার লোভ রিয়ার মূল কারণ'।[১৩] তিনি আরো বলেন, اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار 'জেনে রাখুন! সুনাম ছড়িয়ে পড়া ও প্রসিদ্ধি লাভের মনোবাসনাই হল মান-মর্যাদা লাভের মূল কথা'।[১৪] এজন্যই তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন, وكم من عابد اعتزل في جبل، وراهب انزوى إلى دير، مع قطع طمعهم من مال الناس، لكنه يحب مجرد الجاه 'বহু আবেদ নির্জন পাহাড়ে ইবাদতে নিমগ্ন থেকেছে এবং বহু পাদ্রী-সন্ন্যাসী গির্জা ও উপসনালয়ের নিভৃত কোণে অবস্থান করেছে স্রেফ মর্যাদা লাভের জন্য। মানুষের সম্পদের প্রতি তাদের কোন মোহ ছিল না'।[১৫]

মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়ার প্রবণতাই হল সম্মান-মর্যাদার মোহ। যার অন্তরে মান-মর্যাদা লাভের এই প্রবণতা দানা বাঁধে সে সর্বদা জনতুষ্টবাদী নীতি গ্রহণ করে। মর্যাদা লাভের জন্য সে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরাঘুরি করে এবং তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে ও জানান দিয়ে সব কাজ করে। মানুষকে দেখানোর ও তাদের ভালোবাসা অর্জনের জন্য সে এমনসব কথা ও কাজ করে, যা তাকে মানুষের নিকট মর্যাদাবান ও মহান করে তুলবে। অথচ এতেই মুনাফেকীর বীজ নিহিত রয়েছে। এটি এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধিও বটে। কারণ যে ব্যক্তি মানুষের মনে জায়গা করে নেয়ার বাসনা লালন করে সে তাদের সামনে তার এমনসব গুণ প্রকাশ করে যা আদতে তার মধ্যে নেই। এর ফলে সে ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে, নিষিদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং নানা চটকদার কথা ও কৌশলের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে সচেষ্ট হয়।[১৬] এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ 'দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর'।[১৭]

হাদীছটি দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীন নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া অত্যন্ত মূল্যবান একটি উপমা। রাতের বেলা রাখাল বিহীন ছাগপালের খোয়াড়ে ঢুকে দু'টি ক্ষুধার্ত

৯. *যাহের আশ-শাহরী, আশ-শিরকুল খফী, পৃ. ৩৪।*
১০. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২১২।*
১১. *ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১২২।*
১২. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৯১।*
১৩. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২২।*
১৪. *ঐ. পৃ. ২০৯।*
১৫. *ঐ. পৃ. ২১৭।*
১৬. *ঐ. পৃ. ২১১।*
১৭. *তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১, সনদ ছহীহ।*

নেকড়ে বাঘ যেভাবে ইচ্ছামত বকরী মেরে শেষ করে দেয়। যার হামলা থেকে কোন বকরীই রেহাই পায় না। অনুরূপভাবে অর্থ-সম্পদ এবং নাম-যশ ও পদের লোভ মুমিনদের ঈমানের জ্যোতিকে নিভিয়ে দেয় ও তার দ্বীনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ থেকে উপরোক্ত তিনটি কারণই প্রমাণিত হয়। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ عز وجل هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، 'একজন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদ করে, কেউ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে জিহাদ করে আবার কেউ মানুষকে দেখানোর জন্য জিহাদ করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করল, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল'।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী : يُقَاتِلُ شُجَاعَةً 'বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদ করে' অর্থাৎ মানুষ যেন তার বীরত্বের কথা স্মরণ করে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। يُقَاتِلُ حَمِيَّةً 'ক্রোধের বশবর্তী হয়ে জিহাদ করে' অর্থাৎ সে পরাজিত অথবা নিন্দিত হওয়া অপছন্দ করে। يُقَاتِلُ رِيَاءً 'মানুষকে দেখানোর জন্য জিহাদ করে' অর্থাৎ মানুষ যেন তার অবস্থান ও মর্যাদা দেখতে ও বুঝতে পারে'। এগুলোই হল অন্তরে মান-মর্যাদা লাভের লোভ ও আকাঙ্ক্ষা।[২০]

ইবনু কুদামা মাকদেসী বলেন, فهذه الأمور الثَّلَاثَةُ هِيَ الَّتِي تُحَرِّكُ الْمُرَائِيَ إِلَى الرِّيَاءِ 'এই তিনটি বিষয়ই মানুষকে রিয়ার প্রতি ধাবিত ও প্রলুব্ধ করে'।[২১]

এই তিনটি কারণের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল প্রশংসাপ্রেম। কারণ প্রশংসা লাভের জন্য মানুষ নানারকম কৌশল অবলম্বন করে ও এজন্য দেদারসে অর্থ ব্যয় করে। এমনকি প্রশংসাপ্রীতির জন্যই সে মানুষের নিন্দাকে ভয় করে। ফলে যেকোন উপায়ে মানুষের প্রশংসা লাভই রিয়াকারীর কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) তাইতো বলেছেন, لَا يَجْتَمع الْإِخْلَاصُ فِي الْقلب ومحبة الْمَدْح وَالثنَاء والطمع فِيمَا عِنْد النَّاس إِلَّا كَمَا يَجْتَمع المَاء وَالنَّار والضب والحوت فَإِذا حدثتك نَفسك بطَلَب الْإِخْلَاص فَأقبل على الطمع أَولا فاذبحه بسكين الْيَأْس وَأَقْبل على الْمَدْح وَالثنَاء فازهد فيهمَا زهد عشّاق الدُّنْيَا فِي الْآخِرَة فَإِذا استقام لَك ذبح الطمع والزهد فِي الثَّنَاء والمدح سهل عَلَيْك الْإِخْلَاص 'আগুন ও পানি এবং মাছ ও সাপ যেমন এক জায়গায় থাকতে পারে না, তেমনই যে অন্তরে প্রশংসার মোহ এবং মাল ও মর্যাদার লোভ-লালসা থাকে, সেখানে ইখলাছ থাকতে পারে না। তুমি যদি ইখলাছ অর্জন করতে চাও, তাহলে প্রথমত লোভ-লালসাকে নৈরাশ্যের চাকু দিয়ে যবেহ করে ফেলো। দুনিয়াপ্রেমী যেভাবে আখিরাত থেকে উদাসীন থাকে, তেমনি প্রশংসা ও তোষামোদ থেকে দূরে থাক। তুমি যদি লোভ-লালসাকে যবেহ করতে পারো এবং প্রশংসা শোনা পরিত্যাগ করতে পারো, তবে ইখলাছ অর্জন করা তোমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে'।[২২]

৪. পদের লোভ :

কখনো কখনো পদের লোভ মানুষকে রিয়া ও সুম'আ তথা প্রদর্শনী ও শ্রুতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। সে নেতৃত্ব ও পদ লাভের জন্য এমন ব্যক্তিদের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করে, যাদের হাতে পদে বসানোর ক্ষমতা রয়েছে। এভাবে রিয়ার মাধ্যমে সে নিজেকে পদের যোগ্য প্রমাণের জন্য নেতার মিথ্যা প্রশংসা, তৈলমর্দন ও তোষামোদী সহ হেন কোন অপচেষ্টা নেই যা করে না।

৫. পরিবারে রিয়ার চর্চা :

সন্তান যদি এমন পরিবারে বেড়ে উঠে, যেখানে লৌকিকতা ও শ্রুতির চর্চা হয় প্রতিনিয়ত, তাহলে পারিবারিক প্রভাবে এই বদ-স্বভাবের অনুকরণ করা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকে না। সময়ের পরিক্রমায় এই দুষ্টক্ষত তার অন্তরে এমনভাবে আসন গেঁড়ে বসে যে, রিয়া তার স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।[২৩]

৬. আল্লাহ্‌র প্রকৃত পরিচয় না জানা :

প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্য কর্তব্য হল, আল্লাহ্‌র পরিচয়, তাঁর মর্যাদা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, وليست حاجةُ الأرواح قطُّ إلى شيء أعظمَ منها إلى معرفة بارئها وفاطرها، ومحبته، وذكره، والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه، والزلْفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلّا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلّما

---

১৮. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাল ও মর্যাদার লোভ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় প্রকাশ, আগস্ট ২০২৩), পৃ. ৫-৬।*
১৯. *বুখারী হা/২৮১০; মুসলিম হা/১৯০৪; আহমাদ হা/১৯৫৪৩; শব্দ সমূহ আহমাদের।*
২০. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২২; কাহতানী, নূরুল ইখলাছ, পৃ. ৪৪।*
২১. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২২।*
২২. *ইবনুল কাইয়িম, আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ১৮২।*
২৩. *আশ-শিরকুল খফী, পৃ. ৩০-৩১।*

كان العبد بها أعلَم كان بالله أعرَف، وله أطلَب، وإليه أقرَب. وكلّما كان لها أنكَر كان بالله أجهَل، وإليه أكرَه، ومنه أبعَد 'স্রষ্টার পরিচয় জানা, তাঁকে ভালবাসা, তাকে স্মরণ করা, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তার কাছে অসীলা ও নৈকট্য কামনা করার চেয়ে রূহের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় কোন বস্তু নেই। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর পরিচয় জানা ছাড়া এগুলো অর্জনের কোন উপায় নেই। বান্দা যত বেশী আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর পরিচয় জানবে, সে তত বেশী আল্লাহকে চিনতে পারবে, তার প্রিয় বান্দা হতে পারবে এবং তার নৈকট্য হাছিল করতে পারবে। আর আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে যত কম জানবে, সে আল্লাহ সম্পর্কে তত বেশী অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে থাকবে, তার অপ্রিয় বান্দায় পরিণত হবে এবং তার থেকে দূরে সরে যাবে'।[২৪] সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা জানার ঘাটতি থাকলে আল্লাহকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য আল্লাহ্র পরিচয় ও ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে নেয় যে, বান্দা তার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। তখন সে তার প্রত্যেকটি সৎ আমল মানুষকে দেখানো বা শুনানোর জন্য করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যাতে তার ধারণামতে বান্দার মালিকাধীন কোন বিষয় সে লাভ করতে পারে।[২৫]

ইয়াহ্ইয়া বিন মু'আয (২১৫-২৫৮হি.) বলেন, عجبت من ثلاث : رجل يرائي بعمله مخلوقًا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئًا، ورجل يرغب فى صحبة المخلوقين ومودقم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. 'আমি তিন শ্রেণীর মানুষকে দেখে বিস্মিত হই। ১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমল করার পরিবর্তে তার মতো একজন মাখলূককে দেখানোর জন্য আমল করে। ২. ঐ ব্যক্তি যে তার সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে। তার রব তার কাছে ঋণ চায় অথচ সে তার সম্পদ থেকে আল্লাহকে কোন ঋণ প্রদান করে না। ৩. যে ব্যক্তি মাখলূকের সাহচর্য ও ভালবাসা পেতে চায় অথচ আল্লাহ তাকে তার সাহচর্য ও ভালবাসার দিকে ডাকছেন'।[২৬]

৭. রিয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞতা :

রিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তার আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। এটি দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর ও বিপজ্জনক।[২৭] সুতরাং রিয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে না জানার কারণেও অনেকে রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে।

৮. মুখলিছ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্র ওয়াদা সম্পর্কে বিশ্বাসের দুর্বলতা :

যে খাঁটি বা নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না, তাকে মুখলিছ বা একনিষ্ঠ বলে। মুখলিছ বান্দাদের জন্য যে অফুরন্ত ছওয়াব ও প্রতিদানের অঙ্গীকার আল্লাহ করেছেন, সে সম্পর্কে দুর্বল বিশ্বাসের কারণেও মানুষ রিয়ায় লিপ্ত হয়।

৯. আত্মতুষ্টি :

আত্মতুষ্টি এক মারাত্মক ব্যাধি। এ রোগ বহু মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। কোন মানুষ যখন দুনিয়াবী সম্পদ, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, পদমর্যাদা প্রভৃতি লাভ করে তখন সে আত্মতুষ্টির ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এখেকেই আত্মঅহংকারের জন্ম হয়।[২৮]

আত্মতুষ্টি (العُجْبُ) হল, هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم 'নিয়ামতকে বড় মনে করা এবং নিয়ামতদাতার কথা ভুলে গিয়ে নিয়ামতের দিকে ঝুঁকে পড়া'।[২৯]

আবু ওয়াহাব আল-মারওয়াযী বলেন,

سألت ابن المبارك : ما الكبر؟ قال : أن تزدري الناس قال : وسألته عن العجب قال : أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك قال : و لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب–

'আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করলাম, অহংকার কি? তিনি জবাবে বললেন, 'মানুষকে তুচ্ছ-হীন গণ্য করা'। অতঃপর আমি তাকে আত্মতুষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'তোমার কাছে এমন কিছু আছে যা অন্যের কাছে নেই- এমনটি ভাবাই আত্মতুষ্টি'। ইবনুল মুবারক বলেন, 'আমি মুছল্লীদের মধ্যে আত্মতুষ্টির চেয়ে ক্ষতিকর কোন জিনিস আছে বলে জানি না'।[৩০]

অনেকে নিজের সুস্থতা, সুস্বাস্থ্য, দেহসৌষ্ঠব, সুন্দর আকৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, সম্পদ, বংশমর্যাদা, সন্তান-সন্ততি, দান-ছাদাক্বাহ, ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। অথচ মাসরূক (রহঃ) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ 'মানুষ জ্ঞানী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করে এবং কোন মানুষের মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের আমল নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে'।[৩১]

---

২৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, নূনিয়াতু ইবনিল ক্বাইয়িম আল-কাফিয়াহ আশ-শাফিয়াহ (রিয়াদ : দারু আত্বা'আতিল ইলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খৃ.), পৃ. ৯।

২৫. আশ-শিরকুল খফী, পৃ. ৩০-৩১।

২৬. আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ১৪৬।

২৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২০৮, 'রিয়া ও সুম'আ' অনুচ্ছেদ, ছহীহ তারগীব হা/২৭; মিশকাত হা/৫৩৩৩, হাদীছ হাসান।

২৮. আব্দুর রায্যাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বাদর, আহাদীছু ইছলাহিল কুলূব, পৃ. ৫৭৪-৭৫।

২৯. গাযালী, ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/৩৭১।

৩০. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৮২৬০।

৩১. ইবনু আব্দিল বার্র, জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.), ১/৫৬৯; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৬৮।

অনেক সময় নিজের আমলের প্রতি মানুষের মুগ্ধতা প্রকাশ রিয়া ও শ্রুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মানুষ যেন তার প্রতি আরো বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়, সে চেষ্টা সে করে যেতে থাকে। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس 'ইসলামী শরী'আতে প্রদর্শনী বা আত্মপ্রচারের অবকাশ কারো জন্য নেই। আর মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রিয়ার পথ অবলম্বন করাও শরী'আতসম্মত নয়'।[৩২]

আত্মতুষ্টির ব্যাধি আমলকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ 'তিনটি জিনিস মুক্তিদাতা এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। মুক্তিদাতা তিনটি জিনিস হল, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা, ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রতায় মিতব্যয়িতা। আর ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হল, প্রবৃত্তির দাস হওয়া, কৃপণতা এবং আত্মতুষ্টি-আত্মঅহংকার। আর এটিই সবচেয়ে মারাত্মক'।[৩৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, الْهَلَاكُ فِي اثْنَتَيْنِ، الْقُنُوطِ وَالْعُجْبِ 'দুটি জিনিসে ধ্বংস রয়েছে। নৈরাশ্য ও আত্মতুষ্টি'।[৩৪]

৩২. *তালবীসু ইবলীস. প. ১১৬।*
৩৩. *বায়হাকী. শু'আবুল ঈমান হা/৭৩১; মিশকাত হা/৫১২২; সনদ হাসান।*
৩৪. *ইবনু হাজার হায়তামী. আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, ১/১২১, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, আল-কাবায়ের, পৃ. ৫।*

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!
আত-তাহরীক টিভি
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীহ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।
ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com
মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন
মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪
ফেসবুক পেইজ: At-Tahreek Tv; Monthly At-Tahreek
ইউটিউব চ্যানেল: At-Tahreek Tv; Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لا شيءَ أفسدُ للأعمال من العُجْب ورؤية النفس 'আত্মতুষ্টি ও আত্মমুগ্ধতার চেয়ে অধিক আমল বিনষ্টকারী আর কিছু নেই'।[৩৫]

ইমাম নববী বলেন, اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العُجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله، 'জেনে রাখুন! কখনো কখনো ইখলাছের সামনে আত্মতুষ্টির বিপদ বাঁধ সাধতে পারে। যে নিজের আমল নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে, তার আমল ধ্বংস হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে যে অহংকার করে, তার আমলও ধ্বংস হয়ে যায়'।[৩৬]

১০. অসৎসঙ্গ :

কারো সঙ্গী বা বন্ধু যদি অসৎ ও রিয়াকার হয়, তাহলে সে তার অন্ধ অনুকরণের ফলে লৌকিকতায় জড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে যদি সে দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও অন্যদের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়। কালের পরিক্রমায় এই ব্যাধি তার অন্তরে জেঁকে বসে।[৩৭] এজন্য হাদীছে অসৎসঙ্গীকে কামারের হাপরে ফুঁকদানকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যার কাছে গেলে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় অথবা সে কাপড় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়।[৩৮] অর্থাৎ অসৎসঙ্গীর কাছ থেকে ক্ষতি ও অকল্যাণ ছাড়া কিছুই আশা করা যায় না। *[ক্রমশঃ]*

৩৫. *আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ১৮৬-৮৭।*
৩৬. *মাওসূ'আতুল আখলাক আল-ইসলামিয়াহ ২/৩৪৫।*
৩৭. *আশ-শিরকুল খফী, পৃ. ৩০।*
৩৮. *বুখারী হা/৫৫৩৪।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।
চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে), কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

তাক্বওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত

*-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

(৩৩) তাক্বওয়াশীলদের জন্য ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য : মহান আল্লাহ বলেন, بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، ‘হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও আল্লাহভীরু হও এবং প্রতিপক্ষ তোমাদের উপর হঠাৎ আপতিত হয়, তাহ’লে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন’ *(আলে ইমরান ৩/১২৫)*।

(৩৪) তাক্বওয়া ক্ষমা লাভের মাধ্যম : আল্লাহ্র কাছ থেকে ক্ষমা লাভের অনেক আমল রয়েছে, তার মধ্যে তাক্বওয়া অন্যতম। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، ‘বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করেন ও তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করেন’ *(তালাক ৬৫/৫)*। আবূ সাঈদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ‘তোমাদের পূর্ব যুগের এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা‘আলা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন সে তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করল, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে আগুনে জ্বালিয়ে ছাই করে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা অছিয়ত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ তা‘আলা তার ছাইগুলো জড়ো করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন অছিয়ত করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ ‘হে আল্লাহ! তোমার শাস্তির ভয়ে। ফলে আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে নিল’।[১]

(৩৫) তাক্বওয়া সফলতা লাভের মাধ্যম : মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‘আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৯)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। আল্লাহ আরো বলেন, ‘অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(মায়েদাহ ৫/১০০)*।

(৩৬) তাক্বওয়াশীলকে ক্বিয়ামতের দিন ছায়া দেওয়া হবে : আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের (অথবা আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তাদের একজন হ’ল- وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ، ‘সে ব্যক্তি, যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’।[২]

(৩৭) মুত্তাক্বীরা ক্বিয়ামতের দিন উন্নত মর্যাদা লাভ করবে : ক্বিয়ামতের দিন উন্নত মর্যাদা লাভের অন্যতম মাধ্যম হ’ল তাক্বওয়া। আল্লাহ বলেন, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ‘অবিশ্বাসীদের জন্য পার্থিব জীবনকে শোভনীয় করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীদের উপহাস করে। অথচ ক্বিয়ামতের দিন মুত্তাক্বীরা অবিশ্বাসীদের উপরে থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অপরিমিত রূযী দান করে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ২/২১২)*।

(৩৮) জান্নাতকে তাক্বওয়াশীলদের নিকটবর্তী করা হবে : ক্বিয়ামতের ময়দানে জান্নাতকে আল্লাহ মুত্তাক্বীদের নিকটে নিয়ে আসবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ‘সেদিন জান্নাতকে আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে’ *(শো‘আরা ২৬/৯০)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ‘আর জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করা হবে, দূরবর্তী নয়’ *(ক্বা-ফ ৫০/৩১)*।

(৩৯) মুত্তাক্বীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে : মুত্তাক্বীদেরকে আল্লাহ দুশ্চিন্তা, অশান্তি, ভয়ভীতি সবকিছু থেকে নিরাপত্তা দান করবেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুরা থাকবে নিরাপদ স্থানে’ *(দুখান ৪৪/৫১)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণা সমূহের মধ্যে। তারা সেখানে পরিধান করবে মিহি ও মোটা রেশমের কাপড় সমূহ এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে। এটাই হবে সেদিনের বাস্তবতা। আর আমরা তাদেরকে জোড়া বানিয়ে দেব আনতনয়না হূরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। তারা সেখানে আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না, (দুনিয়ার) প্রথম মৃত্যু ব্যতীত। আর আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হ’তে।

* *তুলাগাঁও নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. *বুখারী হা/৩৪৭৮।*

২. *বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১।*

তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ। সেটাই হবে মহা সফলতা' *(দুখান ৪৪/৫১-৫৭)*।

(৪০) তাক্বওয়াশীলরা চিরকাল পরস্পর বন্ধু থাকবে : মহান আল্লাহ বলেন, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ 'বন্ধুরা সেদিন পরস্পরে শত্রু হবে মুত্তাক্বীরা ব্যতীত' *(যুখরুফ ৪৩/৬৭)*। জান্নাতেও তারা থাকবে পরস্পর বন্ধু হিসাবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে। (বলা হবে) তোমরা এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ কর। (দুনিয়াতে) তাদের পরস্পরের অন্তরে যে বিদ্বেষ ছিল তা আমরা দূর করে দেব। ফলে তারা ভাই ভাই হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি আসনে বসবে' *(হিজর ১৫/৪৫-৪৭)*।

(৪১) মুত্তাক্বীরা আল্লাহ্র মেহমান : দুনিয়ায় যেমন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে সম্মান দেওয়া হয়, তেমিন পরকালে মুত্তাক্বীদেরকে সম্মানের সাথে আল্লাহ্র মেহমান হিসাবে একত্রিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا 'সেদিন আমরা আল্লাহভীরুদেরকে দয়াময়ের নিকটে মেহমান রূপে সমবেত করব' *(মারিয়াম ১৯/৮৫)*।

(৪২) তাক্বওয়াশীলরা যথাযোগ্য আসনে থাকবে : আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও নদী সমূহের মাঝে, যথাযোগ্য আসনে সকল ক্ষমতার অধিকারী সর্বোচ্চ মালিকের সান্নিধ্যে' *(ক্বামার ৫৪/৫৪-৫৫)*।

(৪৩) তাক্বওয়া ক্বিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তি দিবে : মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، 'আর যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, ক্বিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারা কালিমালিপ্ত দেখবে। বস্তুতঃ দাম্ভিকদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়? আর যারা আল্লাহভীরু তাদেরকে আল্লাহ নাজাত দিবেন তাদের সাফল্যগাথা সহ। কোন মন্দই তাদের স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(যুমার ৩৯/৬০-৬১)*।

(৪৪) তাক্বওয়াশীলরা পুলছিরাত সহজে পার হয়ে যাবে : পুলছিরাত হবে অন্ধকার। প্রত্যেকে তাদের ঈমান অনুযায়ী আলো পাবে *(হাদীদ ৫৭/১২)*। আর সমস্ত মানুষকে পুলছিরাত অতিক্রম করেই জান্নাতে যেতে হবে। যা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে এবং প্রত্যেকে তাদের আমল অনুপাতে অতিক্রম করবে।[৩] মুত্তাক্বীরা সহজেই সেটা পার হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে (পুলছিরাত) পৌঁছাবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমরা আল্লাহভীরুদের মুক্তি দিব এবং সীমালংঘনকারীদের নতজানু অবস্থায় তার মধ্যে ছেড়ে দিব' *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*।

(৪৫) মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে ভীতিহীন জীবন : মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 'যারা আল্লাহভীরু হয় ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না' *(আ'রাফ ৭/৩৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। যারা ঈমান আনে ও সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে' *(ইউনুস ১০/৬২-৬৩)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী নন এবং শহীদও নয়। ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র দরবারে তাদের মর্যাদার কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা? তিনি বলেন, তারা ঐসব লোক যারা আল্লাহ্র মহানুভবতায় পরস্পরকে ভালোবাসে অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং পরস্পরকে সম্পদও দেয়নি। আল্লাহ্র শপথ! তাদের মুখমণ্ডল যেমন নূর এবং তারা নূরের আসনে উপবেশন করবে। তারা ভীত হবে না, যখন মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না, যখন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে। তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(ইউনুস ১০/৬২)*।[৪]

(৪৬) তাক্বওয়া পরিত্রাণ দানকারী : জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে তাক্বওয়া। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وثلاثٌ مُنجياتٌ : خشيةُ اللهِ في السِّرِّ والعلانيةِ، والقصْدُ في الفقرِ والغنى، والعدلُ في الغضبِ والرِّضا

'পরিত্রাণ দানকারী তিনটি বিষয় হচ্ছে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, সচ্ছলতা ও দারিদ্রের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তোষ ও অসন্তোষে ন্যায়বিচার করা'।[৫]

---

৩. *বুখারী হা/৬০১৩, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩৬৬।*
৪. *আবু দাউদ হা/৩৫২৭।*
৫. *ছহীহুল জামে' হা/৩০৩৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০২।*

পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে সর্বাধিক মুত্তাক্বী ব্যক্তিকে। আল্লাহ বলেন, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى– ‘নিশ্চয়ই এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে, যে তার ধন-সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং কারু জন্য তার নিকটে কোন অনুগ্রহ থাকে না যা প্রতিদান যোগ্য। কেবলমাত্র তার মহান প্রতিপালকের চেহারা অন্বেষণ ব্যতীত। আর অবশ্যই সে অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে’ *(লায়েল ৯২/১৭-২১)*।

(৪৭) তাক্বওয়াশীলরা দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে : মহান আল্লাহ বলেন, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ– ‘আর যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের দিকে। অবশেষে যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে ও তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে। জান্নাতের দার রক্ষীরা তখন বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর চিরকাল বসবাসের জন্য’ *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ‘তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় কর, তোমাদের আমীরের অনুসরণ কর, তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ কর।[৬]

(৪৮) তাক্বওয়াশীলদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস : মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ‘আর নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে সুন্দর আবাসস্থল’ *(ছোয়াদ ৩৮/৪৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘পক্ষান্তরে যারা আল্লাহভীরু ছিল তাদের যখন বলা হ’ত, তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন? তারা বলত, উত্তম বস্তু। বাস্তবিকই যারা সৎকর্ম করে, তাদের জন্য ইহকালে রয়েছে কল্যাণ এবং তাদের পরকালের গৃহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহভীরুদের আবাসস্থল কতই না উত্তম!’ *(নাহল ১৬/৩০)*। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ‘যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামী হ’তে বিরত রাখে’ হবে জান্নাত তার ঠিকানা’ *(নাযে‘আত ৭৯/৪০-৪১)*।

(৪৯) তাক্বওয়াশীলদের জন্য শুভ পরিণাম : মহান আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ‘আখেরাতের এই গৃহ আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য ও অশান্তি কামনা করে না। বস্তুতঃ শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই’ *(আ‘রাফ ৭/১২৮)*।

(৫০) মুত্তাক্বীদের পুরস্কার জান্নাত : মুত্তাক্বীদের পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। যার প্রতিশ্রুতি তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا، ‘তুমি বল, ওটাই উত্তম, না চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাত উত্তম, যার ওয়াদা মুত্তাক্বীদের দেওয়া হয়েছে? সেটাই হবে তাদের জন্য প্রতিদান ও ঠিকানা’ *(ফুরক্বান ২৫/১৫)*। যে সকল আমলের কারণে মানুষ বেশী জান্নাতে যাবে তাক্বওয়া তার অন্যতম। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ’ল, কোন কর্মটি মানুষকে সবচাইতে বেশী পরিমাণ জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ، ‘আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। আবার প্রশ্ন করা হ’ল, কোন কাজটি সবচাইতে বেশী পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান’।[৭] মহান আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ‘এটা সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহভীরু হবে তাদেরকে’ *(মারিয়াম ১৯/৬৩)*।

(৫১) তাক্বওয়াশীলদের জন্য স্তর বিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদ : মহান আল্লাহ বলেন, لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ ‘কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে স্তরের উপর স্তর বিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদ। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটাই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না’ *(যুমার*

---

৬. *তিরমিযী হা/৬১৬; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৬৭।*

৭. *তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনে মাজাহ হা/৪২৪৬; ছহীহ তারগীব হা/২৬৪২।*

৩৯/২০)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান নক্ষত্র দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে। ছাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এতো নবীগণের জায়গা। তাদের ব্যতীত অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যেসব লোক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে।'[৮]

(৫২) তাক্বওয়াশীলদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ : তাক্বওয়াশীল বান্দাকে আল্লাহ জান্নাত দেওয়ার পাশাপশি আরেকটি নে'মত দান করবেন, সেটা হ'ল তাঁর সন্তুষ্টি। আল্লাহ বলেন, لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ '(আর তাহ'ল) যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল এবং থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সার্বক্ষণিক দ্রষ্টা' *(আলে ইমরান ৩/১৫)*। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! হাযির, আমরা আপনার খেদমতে হাযির। এরপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছ? তারা বলবে, কেন খুশি হব না, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেই দেননি। তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়েও উত্তম সে কোন বস্তু? আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। অতঃপর আমি আর কখনো তোমাদের ওপর নাখোশ হব না'।[৯]

(৫৩) তাক্বওয়াশীলদের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার : আল্লাহ দুনিয়াতে যেমন তাক্বওয়াশীলকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন *(হাদীদ ৫৭/২৮)* তেমনি আখেরাতেও দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন' *(হাদীদ ৫৭/২৮)*। আর তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিকেও পরকালেও দ্বিগুণ পুরস্কার তথা দু'টি জান্নাত দিবেন *(রহমান ৫৫/৪৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি জান্নাতের একটির সকল তৈজসপত্র ও সেখানে যা কিছু আছে সবই হবে রৌপ্য নির্মিত এবং অপরটির হবে স্বর্ণ নির্মিত'।[১০]

পরিশেষে বলব, আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত তাক্বওয়াশীল হয়ে দুনিয়াতে আল্লাহ্র বিধান যথাযথ পালন করতঃ পরকালে জান্নাতবাসী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৮. *বুখারী হা/৩২৫৬; মুসলিম হা/২৮৩১।*

৯. *বুখারী হা/৬৫৪৯; মুসলিম হা/২৮২৯।*

১০. *তিরমিযী হা/২৫২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৬।*

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

ইলম ও আমলের সমন্বয়

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটা কেবল বিশ্বাসের অনুশীলন নয়; বরং জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে গঠিত এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান। ইসলামে একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, অপরদিকে সেই জ্ঞান অনুযায়ী জীবন গঠনের বিশেষ নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম সমাজের বাস্তব চিত্র এই যে, কেউ কেউ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হ'লেও সেই আলোতে পথচলার প্রতিচ্ছায়া তাদের জীবনে অনুপস্থিত; আবার কেউ আমলের দৃঢ়তায় অনড় ও নিরন্তর ইবাদতগুযার। কিন্তু ইলমের বুনিয়াদ দুর্বল হওয়ায় বিভ্রান্তির অন্ধকারে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। অথচ ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে ইলম ও আমলের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মাঝে। যেখানে জ্ঞান হয় পথপ্রদর্শক, আর আমল হয় সেই জ্ঞানের পূর্ণ বাস্তবায়ন। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির দাবী করা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি তা ইসলামের সৌন্দর্যকেও বিকৃত করে তোলে।

ইলমের পরিচয় ও তাৎপর্য :

ইলম (العِلْمُ) আরবী শব্দ। যার অর্থ: জ্ঞান, তথ্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, তত্ত্ব।[১] এটা অজ্ঞতা বা মূর্খতা (الجَهْلُ)-এর বিপরীত। ইমাম বাহাউদ্দীন সুবকী (৭১৯-৭৭৩হি.)-এর মতে, العلم: حصول صورة الشئ في الذهن، 'স্মৃতিপটে কোন কিছুর চিত্র তৈরী হওয়ার নাম হ'ল ইলম'।[২] শায়খ ছালেহ ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন, إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا 'কোন জিনিস তার প্রকৃত রূপে যেমন আছে, তেমনিভাবে সুনিশ্চিত বা সন্দেহাতীতভাবে অনুধাবন করার নামই হ'ল জ্ঞান'।[৩] আর শারঈ ইলমের পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন, العلم الشرعي هو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، 'মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি স্পষ্ট প্রমাণাদি ও হেদায়াত সহ যে জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন, সেটাই হ'ল শারঈ জ্ঞান'।[৪] মোট কথা প্রকৃত ইলম সেটাই, যা আল্লাহ কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর রাসূল ছহীহ হাদীছে বর্ণনা করেছেন। যে জ্ঞানের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারেন, সঠিকভাবে তাঁদের অনুগত্য করতে পারেন, ইবাদতের পদ্ধতি জানতে পারেন এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার কৌশল শিখতে পারেন। এই জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক বান্দার উপর ফরযে আইন। মহান আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، 'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এখানে মহান আল্লাহ 'ঈমান' ও 'আমলের' পূর্বে ইলম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[৫] এই হাদীছের অর্থ হ'ল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, আক্বীদা, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ এবং হালাল-হারাম মেনে চলার বিধান জানা অপরিহার্য। এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ফরয। আর নফল ইবাদতের বিস্তারিত মাসায়েল জানা নফল হিসাবে গণ্য। এছাড়া দুনিয়াবী উপকারী জ্ঞান- যেমন চিকিৎসা, প্রযুক্তি, কৃষি ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করা মুস্তাহাব অথবা জায়েয। তবে ক্ষেত্র বিবেচনায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পার্থিব বিষয়ের জ্ঞানার্জনও কখনো কখনো অপরিহার্য হ'তে পারে।

কোন ইবাদত সম্পাদনের আগে সেই ইবাদতের জ্ঞানার্জন করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ তাওহীদ মনে করে শিরক করে ফেলতে পারে, আবার সুন্নাত মনে করে বিদ'আত করে ফেলতে পারে। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, فضلُ العلمِ أحبُّ إليَّ من فضلِ العبادةِ وخيرُ دِينكمُ الورَعُ، 'ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ'ল আল্লাহভীরুতা'।[৬] হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর বর্ণনায় অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ، 'ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হ'ল পরহেযগারিতা'।[৭] অর্থাৎ ইলম যদি মানুষকে আল্লাহভীরু না বানায়, তবে সেই ইলম প্রকৃত ইলম নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، 'যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে কোন পথ অবলম্বন করে, বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য

---

*. এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯) পৃ. ৭০৭।
২. বাহাউদ্দীন সুবকী, আরূসুল আফরাহ (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আছরিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩হি./২০০৩খৃ.), ২/৫১।
৩. মুহাম্মাদ ছালেহ ইবনে উছায়মীন, আল-উছূল মিন ইলমিল উছূল (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪৩০হি./২০০৯খৃ.), পৃ. ১৫; ঐ, কিতাবুল ইলম, পৃ. ৯।
৪. মুহাম্মাদ ছালেহ ইবনে উছায়মীন, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (সঊদী আরব : দারুল ওয়াত্বান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩হি.) ৭/১৩০।
৫. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।
৬. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৩১৪; ছহীহুল জামে' হা/৪২১৪, সনদ ছহীহ।
৭. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৩৯৬০; বাযযার হা/২৯৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬৮, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী।

জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।[৮] এই হাদীছ প্রমাণ করে, ইলমের পথ মানেই জান্নাতের পথ। কারণ ইলম মানুষকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ চিনতে শেখায়, হালাল-হারামের ব্যবধান বোঝায় এবং সর্বোপরি খাঁটি ঈমান ও বিশুদ্ধ আমলের বুনিয়াদ গড়ে দেয়। আলী (রাঃ) বলেন, الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ، وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، الْمَالُ يُنْقِصُهُ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، 'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান তোমাকে পাহারা দেয়, আর তুমি সম্পদকে পাহারা দেও। সম্পদ ব্যয় করলে কমে যায়, আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'।[৯]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'মহান আল্লাহ তার নবীকে ইলম ছাড়া অন্য কোন কিছু বাড়িয়ে দেওয়ার প্রার্থনার নির্দেশ দেননি। তিনি তাঁর নবীকে বলেন, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'তুমি বল! হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*। অত্র আয়াতে জ্ঞান বলতে 'শারঈ জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। যেই জ্ঞান মুকাল্লাফ বা শরী'আতের আজ্ঞাবহ বান্দাকে তার দ্বীনের বিষয়ে, ইবাদত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ জানতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে'।[১০]

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَيْسَ عَمَلٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ 'ফরয আমল সমূহের পর ইলম অর্জনের চাইতে উত্তম কোন আমল নেই'।[১১] আবূ হানীফা (রহঃ) স্বীয় ছাত্র আবূ ইউসুফ (রহঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, وَإِنْ بَقِيتَ عَشْرَ سِنِينَ بِلَا كَسْبٍ وَلَا قُوتٍ فَلَا تُعْرِضْ عَنْ الْعِلْمِ؛ فَإِنَّكَ إِذَا أَعْرَضْتَ عَنْهُ كَانَتْ مَعِيشَتُكَ ضَنْكًا، 'তোমাকে যদি দশ বছর কোন উপার্জন কিংবা খাবার ছাড়া থাকতে হয়, তবে তা-ই থেকো, তবু ইলম থেকে বিমুখ হয়ো না। কারণ ইলম থেকে বিমুখ হ'লে তোমার জীবনযাপন সংকুচিত হয়ে আসবে'।[১২]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, النَّاسُ مُحْتَاجُونَ إِلَى العِلْمِ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَالْعِلْمُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بِعَدَدِ الْأَنْفَاسِ، 'মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন অধিক। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন হয়। কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োজন হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'।[১৩] রাগেব ইছফাহানী (রহঃ) বলেন, إن الطعام غذاء البدن والعلم غذاء الروح 'খাদ্যদ্রব্য হচ্ছে শরীরের খাবার, আর রূহের খাবার হ'ল ইলম'।[১৪] সালাফগণ বলতেন, الْعِلْمُ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ، يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ، وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ، 'জ্ঞান হ'ল আমলের নেতা, আর আমল হ'ল জ্ঞানের অনুসারী। সৌভাগ্যবানদেরকে এটা প্রদান করা হয়, আর হতভাগাদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয়'।[১৫]

তবে মনে রাখতে হবে যে, ইলম শুধুই মুখস্থ করা বা অর্জন করার বিষয় নয়; বরং তা আমলে বাস্তবায়নের বিষয়। কেননা ইলম মানব জীবনের আলোকবর্তিকা স্বরূপ, যা অন্তরকে জাগ্রত করে, ঈমানকে শাণিত করে, উপকারী চিন্তার উন্মেষ ঘটায়, আমলকে সঠিক ও পরিশুদ্ধ করে এবং জীবনকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার নির্দেশ দেয়।। সুতরাং ইলমের গুরুত্ব অনুধাবন না করে আমলের দাবী করা যেমন অসম্ভব, তেমনি ইলম অর্জন করে তা আমলে পরিণত না করাও আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। আল্লাহ আমাদেরকে উপকারী ইলম হাছিলের তাওফীক্ব দান করুন।

আমলের পরিচয় ও গুরুত্ব :

আমল (العمل) অর্থ- কাজ, কর্ম, ক্রিয়া ইত্যাদি।[১৬] তবে এখানে আমল বলতে 'আল্লাহ্র ইবাদত', 'আমলে ছালেহ' বা সৎ কাজকে বুঝানো হয়েছে। আব্দুর রঊফ মুনাভী বলেন, 'নেক আমল হ'ল দোষ-ত্রুটি মুক্ত সেই কাজ, যার মূল ভিত্তি হ'ল নিয়তের পরিশুদ্ধিতা, যা সর্বোচ্চ সক্ষমতার মাধ্যমে সম্পাদনের প্রচেষ্টা করা হয় এবং যা আমলকারীর জ্ঞান ও শারঈ প্রজ্ঞা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়'।[১৭] মোটকথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক যে কোন কথা, কাজ, চিন্তা ও মনের ভাবনাকে নেক আমল বলা হয়। নেক আমল শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং জিহ্বার মাধ্যমে, অন্তরের মাধ্যমে এবং চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেও নেক আমল সম্পাদিত হয়। তবে সেই আমল কবুলযোগ্য হওয়ার শর্ত হ'ল– তা একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ্র জন্য হ'তে হবে এবং শরী'আত অনুমোদিত পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। ঈমান আনার পরে বান্দার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হ'ল নেক আমল করা। পবিত্র কুরআনের প্রায় সত্তর জায়গাতে মহান আল্লাহ ঈমান আনার পরে নেক আমল করার কথা বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ

---

৮. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

৯. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.) ৫০/২৫২; ওমর মুক্ববিল, মাওয়াইযুছ ছাহাবাহ (রিয়ায : মাকতাবাতু দারিল মানহাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫হি.) পৃ. ৪৭।

১০. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাৎহুল বারী, ১/১৪১।

১১. আবূ নু'আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/৩৬৩।

১২. আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ হামাবী আল-হানাফী, গামযু উয়ূনিল বাছায়ির (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫হি./১৯৭৫খৃ.) ৪/৩১৩।

১৩. ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিইয়াহ, মিফতাহু দারিস সা'আদাত (রিয়ায : দারু আত্বাআতিল ইলম, ১৪৪০হি./২০১৯খৃ.) ১/১৬৮।

১৪. তাফসীরে রাগেব ইছফাহানী ৫/৪৯৮।

১৫. ইবনু আজীবাহ, আল-বাহরুল মাদীদ ১/৩৩৩।

১৬. আল-মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৭১২।

১৭. আব্দুর রঊফ মুনাভী, আত-তাওক্বীফ 'আলা মুহিম্মা-তিত তা'আরীফ (কায়রো : আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪১০হি./১৯৯০খৃ.) পৃ. ২৪৭।

الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস ঠিকানা হিসাবে প্রস্তুত রয়েছে' *(কাহফ ১৮/১০৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য দয়াময় পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন' *(মারয়াম ১৯/৯৬)*।

আর তিনি আমল করার পূর্বে সেই ঈমান ও তাওহীদের ইলম অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، 'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। কেননা জ্ঞানার্জন সঠিক না হ'লে ঈমান-আমলও সঠিক হয় না। সেজন্য আবুল হাসান আল-হার্রালী (মৃ. ৬৩৭হি.) বলেন, العمل ما دبر بالعلم 'প্রকৃত আমল সেটাই যা জ্ঞান অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়'।[18] অর্থাৎ শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করা হয় না; বরং সেই জ্ঞানের দাবী অনুযায়ী যখন আমল করা হয়, তখন সেই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান হিসাবে আখ্যায়িত হয়। যেমনভাবে শুধু হৃদয়ে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি দিলে ঈমানদার হওয়া যায় না; বরং তার সাথে আমল করার মাধ্যমে সেই বিশ্বাস ও স্বীকৃতির দাবী বাস্তবায়ন করতে হয়।

অতএব শুধু ইলম অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; বরং সেই ইলম অনুযায়ী আমল করাও আবশ্যক। কেননা ক্বিয়ামতের ময়দানে এ ব্যাপারে প্রত্যেক বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، 'ক্বিয়ামত দিন আদম সন্তানের পা আল্লাহ্র কাছ থেকে একটুও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে : (১) তার জীবনকাল সম্পর্কে, তা কোন পথে অতিবাহিত করেছে, (২) তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা জীর্ণ করেছে, (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে, (৪) আর তা কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে অনুযায়ী কী আমল করেছে'।[19]

হাদীছটির দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, প্রথম চারটি প্রশ্ন যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, পঞ্চম প্রশ্নটি সেভাবে বলা হয়নি। প্রশ্নের ধরন পরিবর্তন করা হয়েছে।

অর্থাৎ এখানে বলা হয়নি যে, وعن عمله ماذا عمل به (আর তার আমল সম্পর্কে, সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে)। মূলত পঞ্চম প্রশ্নের ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এর মাধ্যমে আরো ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, أن العلم مقدمة العمل وهو لا تعتد به لولا العمل 'ইলম হ'ল আমলের ভূমিকা। ইলমকে ইলম হিসাবে গণ্য করা হয় না যদি না তা আমল দ্বারা পালিত হয়'।[20] তাছাড়া আল্লাহ্র কাছে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার আমলের মাধ্যমে; তার বেশ-ভূষা, চেহার-ছূরাত ও ধন-দৌলতের মাধ্যমে নয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেন না; বরং তিনি তোমাদে অন্তর ও আমল সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেন'।[21] মূলত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছ আমল করার জন্য এবং সেই আমলের ব্যাপারে পরীক্ষা করার জন্য। আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে? *(মুলক ৬৭/০২)*।

অতএব আমলই হচ্ছে ইলমের পূর্ণতা ও ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন। ইলম যদি হয় আলো, তবে আমল হ'ল জীবনকে আলোকিত করার বাস্তব প্রতিফলন। একমাত্র আমলের মাধ্যমেই মুমিন তার জ্ঞানের প্রমাণ দেয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে অগ্রসর হয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণে আমল শুধু ধর্মীয় আচরণ নয়; বরং তা জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলার একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস। কাজেই প্রকৃত সফলতা ও চিরস্থায়ী মুক্তির জন্য ইলমের সঙ্গে আমলের সুনিপুণ সমন্বয় অপরিহার্য।

ইলম ও আমল পরস্পরের পরিপূরক :

ইলম ও আমল হ'ল রেল লাইনের দু'টি পাতের মতো, যার একটি ছাড়া অপরটি অচল। আমল বিহীন ইলমের যেমন কোন মূল্য নেই, ঠিক তেমনি ইলম বিহীন আমলেরও কোন দাম নেই। ইলম ও আমলের সমন্বয়ে ফুটে ওঠে মুমিন বান্দার প্রকৃত দ্বীনদারী। বর্তমান মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় দুর্গতির পিছনে যতগুলো কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে প্রধান কারণ হ'ল ইলম ও আমলের সমন্বয়হীনতা। আমরা যা শিখি, তা কাজে বাস্তবায়ন করি না; যা বলি তা করি না।

১৮. আবুল হাসান আল-হার্রালী, তুরাছু আবিল হাসান আল-হার্রালী (মরক্কো : মানশুরাতুল মারকায আল-জামে'ঈ, ১ম প্রকশ, ১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.) পৃ. ২৩২।

১৯. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; সনদ হাসান।

২০. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৮৫।

২১. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।

আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বীনের কথা প্রচার করি, কিন্তু নিজেদের জীবনে দ্বীনের বাস্তবায়ন নেই। আমরা মানুষকে বলি 'বেশী বেশী ইস্তিগফার করুন', অথচ নিজেরাই ইস্তিগফার করার সময় পাই না। মানুষকে আমলের কথা বলতে বলতে আমরা হয়রান হয়ে যাই, অথচ দিনশেষে নিজের নেক আমলের পাল্লাটা শূন্যই পড়ে থাকে। অথচ স্বর্ণালী যুগের সোনালী মানব সালাফে ছালেহীন আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় ইলম ও আমলের সমন্বয় করতেন। অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন এবং এর বিপরীতটাকে ধ্বংসাত্মক মনে করতেন।

আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) বলেন, يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ، اعْمَلُوا بِهِ؛ فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَلِمَ ثُمَّ عَمِلَ وَوَافَقَ عَمَلُهُ عِلْمَهُ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ تُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، يَقْعُدُونَ حَلَقًا فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى غَيْرِهِ وَيَدَعَهُ، أُولَئِكَ لَا تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 'হে জ্ঞানধারীরা! তোমরা তোমাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করো। কারণ প্রকৃত আলেম তো সেই ব্যক্তি, যে জ্ঞান অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে এবং যার আমল তার জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগামীতে এমন কিছু লোক আসবে, যারা জ্ঞান বহন করবে, কিন্তু সেই জ্ঞান তাদের গলার নীচে নামবে না (অন্তরে প্রবেশ করবে না, প্রভাব ফেলবে না)। তাদের অন্তরের অবস্থা ও বাহ্যিক প্রকাশ পরস্পর বিরোধী হবে। তাদের আমলও তাদের জ্ঞানের বিরোধিতা করবে। তারা বৈঠকে বসবে এবং একে অপরের সামনে নিজেদের জ্ঞান নিয়ে গর্ব করবে। এমনকি একজন ব্যক্তি তার সাথীর ওপর রাগান্বিত হবে শুধু এই কারণে যে, সে গিয়ে অন্য কারো পাশে বসেছে এবং তাকে (আগের জনকে) ছেড়ে দিয়েছে। এমন লোকদের কোন আমলই তাদের ঐসব বৈঠক থেকে আল্লাহ্র কাছে উঠবে না (কবুল হবে না)'।[২২]

আলী (রাঃ)-এর এই বক্তব্যটি বর্তমান সময়ের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে অনেকেই ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে, বই পড়ে, বক্তৃতা দেয়, অন্যদের উপদেশ দেয়; কিন্তু তাদের সেই জ্ঞান নিজের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে না। তাদের অবস্থা হ'ল– ইলম তাদের গলার নীচে নামে না; অন্তরে প্রবেশ করে না। তারা তাওহীদ, ছালাত, ছিয়াম, আমানতদারিতা, পরহেযগারিতা, বিনয় এসব নিয়ে কথা বলে, অথচ নিজেরাই অহংকার করে, ছালাতে গাফেলতি করে, নেক আমলে অলসতা করে, অন্যের সমালোচনায় লিপ্ত থাকে, নানা পাপাচারে জড়িত থাকে, কথা আর কাজে বিস্তর ফারাক তৈরী করে। অনেকে মাহফিল ও আলোচনা সভায় গিয়ে একে অপরের উপর জ্ঞান যাহির করে, কার রেফারেন্স কত বেশী, কার মাহফিলে জনসমাগম বেশী, কে কত চমৎকার উপস্থাপনা করতে পারে, কার আলোচনা মানুষ সবচেয়ে বেশী পসন্দ করে, ইউটিউবে কার ভিউ বেশী- এগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। অথচ এইসব মনোভাব ইখলাছের পরিপন্থী। আমরা অন্যকে ইখলাছের সবক দেই, কিন্তু নিজেরাই লৌকিকতা ঘেরাটোপ থেকে বের হ'তে পারি না। আজকের সমাজে এটি খুবই পরিচিত দৃশ্য। আমরা ইলমের আলোচনায় ব্যস্ত, কিন্তু নিজের জীবনে সেই ইলমের বাস্তব অনুশীলন অনুপস্থিত। ফলে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমরা প্রতিনিয়ত অশান্তির দহনে পুড়ছি। মূলত ইলম ও আমলের সমন্বয়হীনতাই এর জন্য দায়ী। এই অবস্থা না বদলালে আমাদের জ্ঞান শুধু পুঁথিগতই থেকে যাবে, যা ক্বিয়ামতের দিন আমাদের বিপদের কারণ হবে। তাই অর্জিত জ্ঞানের আলোকে নিজেকে সংশোধন করে সেই জ্ঞান আমলে পরিণত করা অপরিহার্য কর্তব্য।

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرّةً، وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرَّةً، 'যে জানেনি এবং আমল করেনি, তার জন্য একবার আফসোস। আর যে জেনেছে কিন্তু আমল করেনি তার জন্য সত্তর বার আফসোস'।[২৩] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, أَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، وَأَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ، 'আমি এমনভাবে ইলম অন্বেষণ করি, যা ইবাদতের জন্য ক্ষতিকর হবে না। আর আমি এমন এমনভাবে ইবাদত করি, যা ইলম অন্বেষণের জন্য ক্ষতিকর হবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করে সে যতটা না সংশোধন করে তার চেয়ে বেশী অনিষ্ট করে'।[২৪]

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر، وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو، وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب الهوى في تعبده، ويضيع كثيرًا من الفرص بالنفل، ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب، ولو كانت عنده شعلة من نور العلم، لاهتدى، 'নিশ্চয়ই জ্ঞানই (দ্বীনের) মূল স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ আলো। কখনো কখনো (জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে) বইয়ের পাতাগুলো উল্টানো নফল ছিয়াম, ছালাত, হজ্জ এবং জিহাদ অপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে। এমন কিছু

২২. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৪হি.) ১/৬৯৭; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি.) ৪২/৫০৯।*

২৩. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ৫৭।*

২৪. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৭/১৮৭; যামাখশারী, রাবীউল আবরার ৪/৩২।*

মানুষ আছে, যে ইলম থেকে বিমুখ থাকার কারণে নিজের ইবাদতে প্রবৃত্তির অনুসরণে ডুবে থাকে। সে নফল ইবাদত করতে গিয়ে অনেক ফরয ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়। ওয়াজিবকে তরক করে তার ধারণাপ্রসূত উত্তম (?) কাজ করে (অথচ শরী'আতে সেটা উত্তম নয়)। যদি তার নিকটে সঠিক জ্ঞানের একটি আলোকবর্তিকা থাকত, তাহ'লে অবশ্যই সে সঠিক পথ পেত'।[২৫]

খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন, فَلَا تَأْنَسْ بِالْعَمَلِ مَا دُمْتَ مُسْتَوْحِشًا مِنَ الْعِلْمِ، وَلَا تَأْنَسْ بِالْعِلْمِ مَا كُنْتَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ وَلَكِنِ اجْمَعْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُكَ مِنْهُمَا، وَمَا شَيْءٌ أَضْعَفُ مِنْ عَالِمٍ تَرَكَ النَّاسُ عِلْمَهُ لِفَسَادِ طَرِيقَتِهِ، وَجَاهِلٍ أَخَذَ النَّاسُ بِجَهْلِهِ لِنَظَرِهِمْ إِلَى عِبَادَتِهِ 'তুমি যতক্ষণ ইলম থেকে বিমুখ থাকবে, ততক্ষণ তুমি আমল করে তৃপ্তি পাবে না। অনুরূপভাবে তুমি যদি আমলে শীথিলতা প্রদর্শন কর, তবে তুমি ইলম অর্জন করে তৃপ্তি পাবে না। সুতরাং তুমি উভয়ের মাঝে সমন্বয় কর। যদিও ইলম-আমল উভয়ের মাঝে তোমার সামান্য কিছু অংশ থাকে'।[২৬]

বর্তমানে অনেকে কেবল আমলে মনোযোগ দেয়, কিন্তু ইলমের দিকে ফিরে তাকায় না। ফলে তাদের আমল হয় অন্ধ অনুসরণ ও বিদ'আতে পূর্ণ। আবার কেউ কেউ কেবল জ্ঞান অর্জনেই ব্যস্ত, বক্তৃতা, লেখালেখি, আলোচনা- সবই করে, কিন্তু নিজের আমলের যিন্দেগীতে অলস প্রকৃতির। ফলে ইলম চর্চা তাদেরকে আত্মতৃপ্তি এনে দিতে পারে না; বরং সেই জ্ঞান তাদের জন্য এক বোঝায় পরিণত হয়। যেমন দেখা যায় কেউ ছালাত-ছিয়াম, নফল ইবাদতে খুবই পরিশ্রম করে, কিন্তু শরী'আত অনুযায়ী সঠিক নিয়ম জানে না; ফলে তার ইবাদত অনেক সময় ভুল পথে চলে যায়। আবার কেউ আরবী ব্যাকরণ, ফিক্বহ, হাদীছ তাফসীর, উছূল ইত্যাদি শিখে; কিন্তু অহংকারে পড়ে যায়, আমলে গাফেল থেকে যায়। সেজন্য অল্প পরিমাণে হ'লেও ইলম ও আমলের দুই দিককে একত্র করা আবশ্যক। আজকের সমাজে অনেক আলেমের জীবনযাত্রা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাদের ইলম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্যদিকে কোন কোন অজ্ঞ লোকের বাহ্যিক ইবাদতের বাহুল্য দেখে মানুষ তার ভুলকেও গ্রহণ করে নেয়, কারণ তারা তার ইখলাছপূর্ণ আমল দেখে মুগ্ধ হয়। ফলে সমাজে ভুল ধারণার বিস্তার ঘটে। এই বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনে। তাই ইলম ও আমলের ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় প্রয়োজন, যেন ব্যক্তিজীবনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং দ্বীনের প্রকৃত সৌন্দর্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, مَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ، إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যে হাদীছই আমার কাছে পৌঁছেছে, আমি জীবনে একবার হ'লেও তার উপর আমল করেছি'।[২৭]

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, 'নিঃসন্দেহে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি হ'ল ইলম। আল্লাহ্র ফরযকৃত বিধানের প্রতিপালন এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জনের প্রধান মাধ্যম এটাই। আল্লাহ যাকে তাওফীক্ব দান করেন তার জ্ঞানের ফলাফল হ'ল তার আমল। এটা প্রত্যেক কল্যাণকার কাজের সংকল্পকে সুনিশ্চিত করে। ইলমবিহীন ঈমান, আমল, সংগ্রাম ও জিহাদের কোন গুরুত্ব নেই। ইলমবিহীন কথা ও কাজের কোন মূল্য নেই। জ্ঞান বিহীন কোন কিছুতে উপকারিতা তো নেই; বরং রয়েছে মারাত্মক ক্ষতি, যা বড় ফাসাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়'।[২৮]

অতএব দ্বীনের জ্ঞান হাছিলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আর এর মূল উদ্দেশ্য হ'তে হবে- সার্বিক জীবনে সেই জ্ঞানের বাস্তবায়ন। নতুবা সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব লাভ করা সম্ভব নয়। মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ وَفَّقَه اللهُ وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ يَزْدَادُ بِالْعِلْمِ فَخْرًا، 'যে ব্যক্তি আমল করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। আর যে ব্যক্তি আমল করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে ইলম তালাশ করে, সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তার অংহকার বৃদ্ধি পায়'।[২৯] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এমন কত আলেম আছে, আল্লাহ যাকে তার অর্জিত ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দেননি, ফলে স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করতে পারেনি। আবার এমন কত সাধারণ লোক আছে, আল্লাহ যাকে নেক আমল করার তাওফীক্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন।[৩০]

সুতরাং ইলম ও ইবাদত একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ইলমের বাস্তবায়ন যার জীবনে যত বেশী, সে ততই আল্লাহমুখী ও কল্যাণকামী মানুষে পরিণত হয়। আর যার ইলম ও আমলের মাঝে দূরত্ব সূচিত হয়, সে নিজে যেমন ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তদ্রূপ সমাজও তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ আমাদের ইলম ও আমলে সীমাহীন বরকত দান করুন। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। ইলম ও আমলের ভারসাম্য বজায় রেখে তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলের মাধ্যমে আমৃত্যু ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল-অবিচল থাকার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

২৫. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃঃ ১১৩।*
২৬. *খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমল, মুহাক্কিক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.), পৃ. ১৪।*
২৭. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০৫হি./১৯৭৫খৃ.), ৭/২৪২।*
২৮. *ইবনে বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ৪/৫৯।*
২৯. *আবূ নু'আইম আছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৭৮।*
৩০. *মুহাম্মাদ খাদেমী, বারীক্বাহ মাহমূদিয়্যাহ (দামেশক : মাত্ববা'আতুল হালাবী, ১৩৪৮হি.), ১/২৯৯।*

আল-কুরআনে আয়াত সংখ্যা : একটি পর্যালোচনা

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

ভূমিকা : আল-কুরআন মুসলিম উম্মাহ্র নিকটে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। তিনি এর হরফ, কালিমা, আয়াত, সিজদাসহ সবকিছুই হেফাযতের দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ঠিক কতটি? ক্বিরাআত ও গণনাপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে এই সংখ্যা ভিন্ন হ'তে দেখা যায়। যত অভিমত এসেছে, তার সবগুলোই ছয় হাযারের উপরে। তবে বিশুদ্ধ মতে, কুরআনের সর্বমোট আয়াত হচ্ছে ছয় হাযার দুইশত ছত্রিশটি (৬২৩৬) এবং প্রতিটা সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' সহ ছয় হাযার তিনশত ঊনপঞ্চাশটি (৬৩৪৯)। আলোচ্য প্রবন্ধে বিষয়টি তাফসীর, হাদীছ, তারীখ, চার মাযহাবের ইমাম ও সালাফী আলেমদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হ'ল।

আয়াতের পরিচয় : آية শব্দের আভিধানিক অর্থ: নিদর্শন, চিহ্ন, প্রমাণ। কুরআনের পরিভাষায় এমন প্রতিটি বাক্য বা বাক্যাংশ যা স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে এবং অহী দ্বারা নির্ধারিত, তা হচ্ছে আয়াত। আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, الْآيَةُ لُغَةً: الْعَلَامَةُ وَالْعِبْرَةُ، وَشَرْعًا هِيَ جُزْءٌ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَبَيَّنَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ تَوْقِيفًا. 'ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াত হ'ল- নিদর্শন ও উপদেশ। আর শরী'আতের পরিভাষায়, 'এটি কুরআনের একটি সূরার অংশ, যার শুরু ও শেষ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত (তাওক্বীফী) হয়েছে'।[১]

আয়াত গণনায় পার্থক্যের কারণ

আয়াত সংখ্যার ভিন্নতা মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

(১) ক্বিরাআতের পার্থক্য : ভিন্ন ক্বিরাআতের ভিত্তিতে বাক্য বিভাজনে ভিন্নতা ঘটে।

(২) ওয়াকফ ও ইবতিদা (থামার জায়গা ও শুরু) : কোথায় একটি আয়াত শেষ হবে তা ভিন্নভাবে নির্ধারিত হ'তে পারে।

(৩) মাক্কী ও কূফী গণনা পদ্ধতি : বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক গণনার নিয়মে পার্থক্য থাকার কারণে সংখ্যায় পার্থক্য হ'তে পারে। এর কারণ সম্পর্কে ইমাম যারকাশী (রহঃ) বলেন, وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي عَدِّ الْآيِ وَالْكَلِمِ وَالْحُرُوفِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ كَانَ يَقِفُ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ لِلتَّوْقِيفِ فَإِذَا عُلِمَ مَحَلُّهَا وَصَلَ لِلتَّمَامِ فَيَحْسَبُ السَّامِعُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَاصِلَةً وَأَيْضًا الْبَسْمَلَةُ نَزَلَتْ مَعَ السُّورَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ فَمَنْ قَرَأَ بِحَرْفٍ نَزَلَتْ فِيهِ عَدَّهَا وَمَنْ قَرَأَ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَعُدَّهَا 'জেনে রাখো, আয়াত, শব্দ ও অক্ষরের গণনায় আলেমদের মাঝে যে মতভেদ হয়েছে, তার কারণ হ'ল: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়াতসমূহের শেষে থামতেন অহীর নির্দেশ মোতাবেক। এরপর যখন আয়াতের স্থান নির্ধারিত হয়ে যেত, তখন তিনি সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করতেন (সংযুক্তভাবে)। ফলে শ্রোতাদের কেউ কেউ ধারণা করত যে এটি পৃথক আয়াত নয়। আর একটি কারণ হ'ল কিছু ক্বিরাআতে (সাত হরফের এক বা একাধিক রূপে) সূরার সাথে 'বিসমিল্লাহ' নাযিল হয়েছে। তাই যারা সেই পাঠভেদে ক্বিরাআত করেন তারা এটিকে আয়াত হিসাবে গণ্য করেন, আর যারা অন্যান্য পাঠভেদে পাঠ করেন তারা এটিকে আয়াত হিসাবে গণ্য করেন না'।[২]

ইমাম ফায়রুযাবাদী বলেন, وأمّا عدد الآيات فإن صدر الأُمّة وأئمة السّلف من العلماءِ والقراءِ كانوا ذوى عنايةٍ شديدة فى باب القرآن وعِلمه؛ حتى لم يبق لفظ ومعنى إلاَّ بحثوا عنه، حتى الآيات والكلمات والحروف، فإنهم حَصَروها وعدُّوها. وبين القرّاءِ فى ذلك اختلاف؛ لكنَّه لفظى لا حقيقىّ. 'আয়াতের সংখ্যার বিষয়ে পূর্ববর্তী উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সালাফদের ইমামগণের মধ্যকার কুরআনের আলেম ও ক্বারীগণ কুরআনের ইলমে গভীরভাবে মনোযোগী ছিলেন। এমনকি কোন শব্দ বা অর্থ এমন নেই, যা নিয়ে তারা আলোচনা করেননি। তারা আয়াত, শব্দ এবং অক্ষর সব গণনা করেছেন। এই গণনায় ক্বারীগণের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে, তবে তা শব্দগত (لفظي) মতভেদ, বাস্তবিক অর্থে (حقيقي) কোন মতভেদ নয়'।[৩]

আয়াত সংখ্যার মতপার্থক্যের কারণ সম্পর্কে ইমাম আব্দুল আযীম যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, 'এই মতভেদের মূল কারণ হ'ল নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন আয়াতের শেষে থেমে যেতেন। যাতে তারা বুঝতে পারে যে, এটি একটি পূর্ণ আয়াত। আর যখন তারা সেটা ভালোভাবে শিখে নিত, তখন তিনি অর্থের পূর্ণতা লাভের জন্য ঐ আয়াতকে পরবর্তী আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তেন। ফলে কেউ কেউ মনে করত, যেখানে রাসূল (ছাঃ) থেমেছিলেন সেটি পূর্ণ আয়াত নয়। তাই তারা পরবর্তী অংশসহ একসাথে

**. সিনিয়র শিক্ষক, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজ।*

১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১/১২৪।*

২. *আল-বুরহানু ফী উলূমিল কুরআন ১/২৫১-২৫২।*

৩. *বাছায়ের যাভিত-তামীয ফী লাতাইফিল কিতাবিল আযীয ১/৫৫৮।*

পড়ে সেটিকে একটি আয়াত বলে গণ্য করত। আবার কেউ কেউ সেটিকে একটি স্বতন্ত্র আয়াত ধরে সেখানে থেমে যেত এবং পরবর্তী অংশকে নতুন আয়াত বলে গণ্য করত। আর এতে গুরুতর কোন সমস্যা নেই। কারণ এতে কুরআনের মধ্যে না কোন অংশ বেড়ে যায়, না কোন অংশ কমে যায়'।[৪]

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, سَبَبُ اخْتِلَافِ السَّلَفِ فِي عَدَدِ الْآيِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقِفُ عَلَى رؤوس الْآيِ لِلتَّوْقِيفِ فَإِذَا عُلِمَ مَحَلُّهَا وَصَلَ لِلتَّمَامِ فَيَحْسَبُ السَّامِعُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَاصِلَةً 'আয়াতের সংখ্যায় সালাফদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার কারণ হ'ল, নবী করীম (ছাঃ) অহী আসার সময় তাওক্বীফ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থানে থামার উদ্দেশ্যে আয়াতের শেষে থেমে যেতেন। অতঃপর যখন তিনি সেই নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করতেন তখন আবার পূর্ণ অর্থ বোঝার জন্য বাক্য চালিয়ে যেতেন। ফলে শ্রোতা অনেক সময় ধারণা করতেন যে, সেখানে থামা হ'লেও সেটি কোন আয়াতের শেষ (ফাছিলা) নয়।[৫]

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, فَقَدْ وَقَعَ إِجْمَاعُ الْعَادِّينَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ سِتَّةُ آلَافٍ وَمِئَتَا آيَةٍ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْكَسْرِ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ، 'আয়াত গণনাকারী বিদ্বানদের মধ্যে এ বিষয়ে সর্বসম্মত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ছয় হাযার দুইশত। এরপর এর অতিরিক্ত ভগ্নাংশ (অর্থাৎ কত আয়াত তার চেয়ে বেশী) নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[৬]

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, الاختلاف في عدد الآيات أمر ليس بضار؛ ولهذا في سورة الفاتحة كما تعلمون، 'আয়াতের সংখ্যার পার্থক্য কোন ক্ষতিকর বিষয় নয়। যেমন তোমরা জানো, সূরা ফাতেহার ক্ষেত্রেও (এই পার্থক্য) রয়েছে'।[৭]

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের দৃষ্টিভঙ্গি :

সরাসরি ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী বিদ্বানগণের আলোচনা থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম আবু আমর আদ-দানী (মৃ. ৪৪৪ হি.) বলেন, الاختلاف في عدد آي القرآن إنما هو لاختلافهم في رؤوس الآي، وليس في نفس القرآن، 'কুরআনের আয়াত সংখ্যার পার্থক্য কেবল আয়াত শুরুর স্থানে মতভেদের কারণে। এছাড়া কুরআনের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই।[৮] তিনি আরো বলেন, أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ سِتَّةُ آلَافِ آيَةٍ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَزِدْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَمِائَتَا آيَةٍ وَأَرْبَعُ آيَاتٍ وَقِيلَ: وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ: وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ: وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَقِيلَ: وَسِتٌّ وَثَلَاثُونَ، 'তারা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ছয় হাযার। এরপর এ সংখ্যার অতিরিক্ত অংশ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতিরিক্ত কিছু বলেননি। আবার কেউ বলেছেন, আরও ২০৪টি আয়াত আছে। কেউ বলেছেন, আরও ১৪টি। কেউ বলেছেন, আরও ১৯টি। কেউ বলেছেন, আরও ২৫টি। আবার কেউ বলেছেন, আরও ৩৬টি আয়াত রয়েছে'।[৯]

চার মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের অনুসারীদের মতামত :

চার মাযহাবের ইমামগণ আয়াত সংখ্যা নির্ধারণে সরাসরি মত দেননি, তবে তাঁদের মাযহাবভুক্ত ক্বারী ও তাফসীরকারগণ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন :

হানাফী মাযহাবের অবস্থান : ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বা তার মাযহাবের অভিমত তুলে ধরে ইমাম যারকাশী (রহঃ) বলেন, اعتمد أهل الكوفة على عدد الآيات ٦٢٣٦، وهو ما جرى عليه علماء الحنفية، 'কুফাবাসীরা ৬২৩৬ আয়াতের গণনার উপরে নির্ভর করতেন। হানাফী আলেমগণ সেটাই গ্রহণ করেছেন'।[১০]

মালেকী মাযহাবের অভিমত : ইমাম মালিক (রহঃ) ও তাঁর মাযহাবের বিদ্বানগণ মাদানী গণনার অনুসারী ছিলেন। العدد المدني الأول: ٦٢١٤، وهو الذي عليه أهل المدينة في أول الأمر، 'মাদানী প্রথম গণনা অনুযায়ী আয়াত সংখ্যা ৬২১৪, যা ছিল মদীনাবাসীদের প্রাথমিক মত'।[১১]

শাফেঈ মাযহাবের অবস্থান : ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও তাঁর মাযহাবের বিদ্বানগণ কূফার গণনাকে গ্রহণ করেছেন। যেমন শাফেঈ মাযহাব সম্পর্কে বলা হয়েছে, وقد اعتمد الشافعية على عدد مقارب لعدد الكوفي، إلا أنهم اعتبروا بعض الوقفات 'আর শাফেঈরা কূফী সংখ্যার কাছাকাছি আয়াত গণনা গ্রহণ করেছেন, তবে কিছু ওয়াকফ স্থানকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন।

হাম্বলী মাযহাবের অবস্থান : ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও তার মাযহাবের বিদ্বানগণ কূফী গণনা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। যেমন বলা হয়েছে, غالب الحنابلة ساروا على

---

৪. *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন ১/৩৪৪।*
৫. *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন ১/২৩১।*
৬. *ফুনূনুল আফনান ফী উউনি উলূমিল কুরআন ২৪২, ২৪৬ পৃ.।*
৭. *তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, সূরা ফাতিহার ১ আয়াতের তাফসীর দ্র.।*
৮. *আল-বায়ান ফী আদাদি আইয়িল কুরআন, পৃ ২৭।*
৯. *সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ১/২৩২।*
১০. *যারকাশী, আল-বুরহান ১/২৪২।*
১১. *ওছমান ইবনু সাঈদ আদ-দানী, আল-বায়ান ফী আদাদি আইয়িল কুরআন, পৃ. ৬৭-৬৮।*

العدد الكوفي لكونه الأوسع انتشارًا 'হাম্বলীদের অধিকাংশই কূফী গণনাকেই গ্রহণ করেছেন, কারণ সেটাই সবচেয়ে বিস্তৃত (*আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন*)।

আয়াত গণনার পদ্ধতি :

নিম্নের ছকে প্রধান পাঁচটি গণনাপদ্ধতি উল্লেখ করা হ'ল :

পদ্ধতি	আয়াত সংখ্যা	উল্লেখযোগ্য অনুসারী
কূফী গণনা	৬২৩৬	আলী (রাঃ) ও ক্বারী হাফছ, আছেম; এটিই অধিকাংশ মুদ্রণে প্রকাশিত।
মাদানী (১ম)	৬২১৭	পুরাতন মাদানী ক্বারীগণ।
মাদানী (২য়)	৬২১৪	ইমাম ইসহাকের অনুসারীগণ।
মাক্কী গণনা	৬২১০	ছাহাবী উবাই ইবনু কা'ব ও মাক্কী ক্বারীগণ।
শামী গণনা	৬২২৬	শাম অঞ্চলের ক্বারীগণ।
বছরী গণনা	৬২০৪	ক্বারী আইউব বিন মুতাওয়াক্কিল এর অনুসারীগণ।

(বিস্তারিত: আবূ আমর ওছমান বিন সাঈদ রচিত, আল-বায়ান ফী আদ্দে আইয়িল কুরআন ১/৭৯-৮১; তাফসীরে কুরতুবী ১/৬৫)।

বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ত্বাহের আল-জাযায়েরী (রহঃ) তার আত-তিবইয়ানগ্রন্থে বলেন, 'কুরআনের আয়াত সংখ্যা বিষয়ে গণনাকারীগণ একমত যে, তা ছয় হাযার দুইশত আয়াতের কিছু বেশী। তবে এই 'কিছু বেশী' অংশটি গণনাকারীদের ভিন্নমতের কারণে ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

* মদীনার প্রথম গণনা মতে (المدني الأول) আয়াত সংখ্যা ৬২১৭। এ মত দিয়েছেন ইমাম নাফে'।
* মদীনার দ্বিতীয় গণনা মতে (المدني الأخير) আয়াত সংখ্যা ৬২১৪ (শায়বা অনুসারে) ও ৬২১০ (আবু জা'ফর অনুসারে)।
* মাক্কী গণনা মতে, আয়াত সংখ্যা ৬২২০।
* কূফী গণনা মতে, আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬, যা হামযাহ আয-যাইয়াত থেকে বর্ণিত। আর এটিই অধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।
* বছরার গণনা মতে, আয়াত সংখ্যা ৬২০৫, যা আছেম আল-জাহদারী থেকে বর্ণিত। তাঁর একটি রেওয়ায়াতে ৬২০৪ এবং আইয়ূব ইবনু আল-মুতাওয়াক্কিল আল-বছরী এ মত দিয়েছেন।
* আর এক বর্ণনায় বছরাবাসীরা ৬২১৯ বলেছেন। এটি ক্বাতাদাহ থেকেও বর্ণিত।
* শামী (সিরিয়ান) গণনা মতে, আয়াত সংখ্যা ৬২২৬, যা ইয়াহইয়া ইবনু হারিছ আছ-যিমারী থেকে বর্ণিত।

ইমাম আদ-দানী আরও বলেন, মাক্কী গণনা আব্দুল্লাহ ইবনু কাছীর (সাত ক্বারীর অন্যতম) থেকে সংরক্ষিত, যিনি এটি মুজাহিদ হ'তে, তিনি ইবনু আব্বাস, তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন।[১২]

১২. *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন ১/৩৪৪*।

৬৬৬৬ আয়াত : একটি ভিত্তিহীন প্রচলন :

অনেকে বলেন, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি। কিন্তু এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এটা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর অভিমত বলেও চালিয়ে দেন। কিন্তু এরও কোন ভিত্তি নেই। তবে একটি দুর্বল সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা এসেছে, যাতে কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬২৬টি বলা হয়েছে।[১৩] পাকিস্তানী লেখক প্রফেসর আব্দুছ ছামাদ ছারেম (রহ.) তার তারীখুল কুরআন গ্রন্থে উর্দূ ও বাংলাভাষীদের মাঝে এই বিভ্রান্তির সূচনা করেন বলে অনেক বিদ্বান মনে করেন। তিনি তার এই কিতাবে 'গণনা' শিরোনামে অক্ষর, শব্দ ও আয়াতসংখ্যা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার সবচেয়ে বড় দুর্বল দিক হ'ল গ্রন্থ রচনার উৎস। তার উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আয়াতসংখ্যা সংশ্লিষ্ট কোন গ্রন্থ নেই। অথচ এই গ্রন্থ রচনাকালে (১৯৬৩) এ বিষয়ের অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। ঐ সময়ে দুনিয়া জোড়া প্রসিদ্ধ ছিল মিসরীয় মুছহাফ। ঐ মুছহাফের শেষেও এ শাস্ত্রের কিছু গ্রন্থের আলোচনা ছিল। তিনি হয়ত এসবের ব্যাপারে অবগত ছিলেন না অথবা তিনি এগুলো পড়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

দুর্বলতার দ্বিতীয় দিক হ'ল, এ আলোচনায় তিনি শুধু তিনটি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইবনুল জাওযী (রহঃ)-এর ফুনূনুল আফনান, সুয়ূতী (রহঃ)-এর 'আল-ইতক্বান' এবং আহমাদ উশমূনীর 'মানারুল হুদা ফিল ওয়াকফি ওয়াল ইবতিদা'।[১৪] কিন্তু তিনি এ আলোচনায় এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যা এ তিন কিতাবের কোন কিতাবে নেই। এজন্য ভিন্ন কোন উদ্ধৃতিও তিনি ব্যবহার করেননি। অথচ এসব বিষয়ের কিছু সন্দেহযুক্ত, কিছু একেবারে ভুল এবং বাস্তবিরোধী। আর অবাক করা বিষয় হ'ল, আলোচনায় তিনি এমন সব কথাও এনেছেন যা উক্ত তিন কিতাবের পরিপন্থী।

দুর্বলতার তৃতীয় দিক হ'ল, তিনি আলোচনায় সাধারণ বোধ ও স্বাভাবিক বিষয়গুলোর দাবীও সামনে রাখেননি। তাই তার আলোচনায় এমন কিছু কথাও এসেছে যা স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যায়।

১. ইমাম আল-সাখাভী (মৃ. ৯০২ হি.) বলেন, وأما ما يشتهر على ألسنة الناس من أن عدد آياته ستة آلاف وست مائة وست وستون، فليس له أصل يعتمد عليه 'মানুষের মুখে প্রচলিত যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ছয় হাযার ছয়শত ছিষট্টি (৬৬৬৬)-এর কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই।[১৫]

২. ইমাম সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন, وقد ورد عن ابن عباس أن عدد الآيات ستة آلاف وست مائة وست وستون،

১৩. *আল-ইতক্বান ১/২৩১*।
১৪. *তারিখুল কুরআন ১১৯ পৃ.*।
১৫. *আল-কাউলুল বাদী' ফিছ ছালাতে আলাল হাবীবিশ শাফী' পৃ. ৩৪৫; জামালুল কুররা ওয়া কামালুল ইকরা' ১/২৭৪*।

ولكنه قول لا يصح سنده، ولم يثبت عن الصحابة 'ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আয়াত সংখ্যা ছয় হাযার ছয়শত ছিষট্টি বর্ণিত হ'লেও এর সনদ ছহীহ নয় এবং এটি ছাহাবীদের থেকে প্রমাণিত নয়'।[১৬]

৩. কোন কোন বিদ্বান বলেন, هذا الرقم ليس له أصل في الأحاديث الصحيحة، بل هو من الأقوال لمشهورة عند الناس فقط، ولا يعتمد عليه. 'এই সংখ্যার (৬৬৬৬) ছহীহ হাদীছে মূলসূত্র নেই; বরং এটি কেবল সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ কথা মাত্র। যার ওপর নির্ভর করা যায় না'।[১৭]

৪. ড. ছালেহ আলে শায়খ বলেন, لا يوجد نص صحيح في تحديد عدد الآيات بـــ (٦٦٦٦)، وإنما هو رقم اشتهر عند المتأخرين بدون دليل. (محاضرات علوم القرآن، وزارة الشؤون الإسلامية السعودية) 'কোন ছহীহ সূত্রে ৬৬৬৬ আয়াত নেই; এটি কেবল পরবর্তী যুগের কিছু মানুষের মাঝে প্রখ্যাত হয়ে গেছে, যার কোন ভিত্তি নেই।

সূরা অনুযায়ী আয়াত সংখ্যার পার্থক্য হওয়ার কারণ

আয়াতসংখ্যা অনুযায়ী সূরাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত :

প্রথম ভাগ : যেসব সূরার আয়াতসংখ্যার ব্যাপারে মোটেও মতভেদ নেই। এই ভাগে অন্তর্ভুক্ত সূরাগুলোর আয়াতসংখ্যা ও বিভাজন বিষয়ে ক্বারীগণ এবং অঞ্চলভেদে কোনরূপ মতভেদ করেননি। এমন সূরার সংখ্যা ৪০টি। যেমন- সূরা ইউসুফ ১১১ আয়াত, সূরা হুজুরাত ১৮ আয়াত, সূরা নাহল ১২৮ আয়াত, সূরা ফুরক্বান ৭৭ আয়াত প্রভৃতি সূরা।

দ্বিতীয় ভাগ : যেসব সূরার মোট আয়াতসংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ নেই, কিন্তু আয়াত বিভাজনের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। এই সূরাগুলোর মোট আয়াতসংখ্যা সকলের নিকট এক হ'লেও, কোন শব্দ বা বাক্যকে আলাদা আয়াত ধরা হবে কি-না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এরূপ সূরা ৪টি। যথা সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য নেই। কিন্তু মতপার্থক্য রয়েছে 'বিসমিল্লাহ'সহ না কি ছাড়া এ বিষয়ে। অনুরূপ সূরা ক্বাছাছ (৮৮ আয়াত) কূফার গণনাকারীগণ: "طسم" এক আয়াত এবং অন্যরা أمة من الناس يسقون-কে এক আয়াত হিসাবে গণ্য করেছেন। সূরা আনকাবূত (৬৯ আয়াত), কূফীরা : "الم" কে এক আয়াত এবং বছরীরা: "مخلصين له الدين" কে এক আয়াত গণনা করেছেন। শামী ক্বারী : "وتقطعون السبيل" এগুলো আলাদা আয়াত হিসাবে ধরেছেন।

সূরা জিন (২৮ আয়াত) : মাক্কী : "لن ينجيني من الله أحد" পৃথক আয়াত এবং অন্যরা : "ولن أجد من دونه ملتحدا" কে আয়াত ধরেছেন।

সূরা আছর (৩ আয়াত) : মাদানী (শেষ ধারা) : وتواصوا بالحق পৃথক আয়াত, তবে "والعصر" পৃথক আয়াত নয়। অন্যরা বিপরীতভাবে গণনা করেন।

তৃতীয় ভাগ : যেসব সূরার আয়াত সংখ্যা নিয়ে সার্বিকভাবেই মতভেদ রয়েছে (সংখ্যা ও বিভাজন উভয় ক্ষেত্রে) : এই ভাগে থাকা সূরাগুলোর আয়াতের মোট সংখ্যা ও বিভাজন উভয় বিষয়েই মতপার্থক্য রয়েছে। এমন সূরার সংখ্যা: ৭০টি।

উল্লেখ্য যে, আয়াত শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে কখনও কুরআনের একটি আংশিক বাক্য বা দু'টি আয়াত মিলিয়ে "এক আয়াত" বলে উল্লেখ করা হয়, যা মাজায বা সাধারণ ভাষার প্রয়োগ।

উদাহরণ :

১. আয়াতের একাংশকে আয়াত বলা (মাজায) : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "আশাব্যঞ্জক আয়াতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আয়াত হ'ল : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ অথচ এটি মূলতঃ সূরা রা'দ, আয়াত ৬-এর একটি অংশ। এটি একটি দীর্ঘ আয়াতের শেষাংশ।

২. দু'টি আয়াত একত্রে এক আয়াত বলে উল্লেখ করা : যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে দৃঢ় বিধান সম্পন্ন আয়াত হ'ল : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ যদিও বাস্তবে এটি সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াত। কিন্তু দু'টি আয়াতকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮]

আয়াত গণনা পদ্ধতি এক হ'লেও আয়াতের সূচনা ও শেষ নির্ধারণে মতভেদ হয়েছে। আরো কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

সূরা ইখলাছ :

١. قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، ٢. اللهُ الصَّمَدُ، ٣. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، ٤. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ-

সূরা ইখলাছে ৪টি আয়াত আছে, কূফী, বাছরী, মাদানী (১ম ও ২য়)। গণনা পদ্ধতিতে এই সূরাতে ৪টি আয়াত আছে। তবে মাক্কী ও শামী গণনা পদ্ধতিতে এই সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। যেমন-

١.قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد، ٢. اللهُ الصَّمَد، ٣. لَمْ يَلِدْ، ٤. وَلَمْ يُولَدْ، ٥. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد

এটি মাক্কী ও শামী গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সূরা ইখলাছ,

---

১৬. *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন ১/১২৩।*
১৭. *ইমাম ইবনু কাছীর, ফাযায়েলুল কুরআন, তাহক্বীক, শুআইব আরনাঊত্ব, (মুআস্সাতুর রিসালাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.), পৃ. ৪৭।*
১৮. *আব্দুল আযীম যুরক্বানী, মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন ১/৩৪৪; সুয়ূতী, আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন ১/২৩৩-২৩৫, ৪/১৪৯-১৫১; যারকাশী, আল-বুরহানু ফী উলূমিল কুরআন ১/৪৮৮)।*

যেখানে ৫টি আয়াত দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, এই গণনাতে একটি আয়াত ২টি গণনা করা হয়েছে। এখানে কূফী, বাছরী ও মাদানী (১ম ও ২য় উভয়) পদ্ধতিতে (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) এই অংশটিকে একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু মাক্কী ও শামী গণনায় (لَمْ يَلِدْ) অংশকে ১টি ও (وَلَمْ يُولَدْ) অংশকে আরেকটি পৃথক আয়াত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে ৪টি আয়াতের স্থলে ৫টি আয়াত হয়েছে। আর এটি কোন প্রকার সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে ঘটেনি।

সূরা কুরাইশ :

১. لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ، ٢. إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ، ٣. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ، ٤. ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ-

কূফী, বাছরী ও শামী এই তিন গণনা পদ্ধতিতে সূরা কুরাইশের আয়াত সংখ্যা চার, যা আমরা উপরে দেখলাম। আর মাক্কী ও মাদানী (১ম ও ২য়) গণনা পদ্ধতিতে এই সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। যেমন-

١. لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ، ٢. إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ، ٣. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ، ٤. ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ- ٥. وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ-

এই গণনা পদ্ধতিটি মাক্কী ও মাদানীর। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, উপরের কূফী, বাছরী ও শামী এই তিন গণনা পদ্ধতিতে (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) এই অংশটিকে পরিপূর্ণ একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করা হ'লেও বাকী দুই পদ্ধতি অর্থাৎ মাক্কী ও মাদানী গণনা পদ্ধতিতে (الذي أطعمهم من جوع) কে একটি ও (وآمنهم من خوف) কে পৃথক আরেকটি আয়াত গণ্য করা হয়েছে। তবে মূল পাঠ সবসময়ই এক ও অভিন্নই রয়েছে। কোন সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে এই পার্থক্য হয়নি।

সূরা আছর :

١. وَٱلْعَصْرِ، ٢. إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ، ٣. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ-

সূরা আছরের আয়াত সংখ্যা সকল প্রকার গণনা পদ্ধতি অনুসারেই ৩টি। দ্বিতীয় মাদানী গণনা ছাড়া সকল প্রকার গণনা পদ্ধতিতে এভাবেই আয়াতের শুরু ও শেষ বা ফাওয়াছিল (فواصل) নির্ধারণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাদানী পদ্ধতিতে নিম্নরূপভাবে ফাওয়াছিল (فواصل) নির্ধারণ করা হয়েছে-

١. وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ، ٢. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ، ٣. وَتَوَاصَوا بِٱلصَّبْرِ

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় মাদানী ছাড়া অন্যান্য সকল গণনায় (وَٱلْعَصْرِ) ও (إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ)-কে পৃথক আয়াত গণনা করা হয়েছে। তবে মাদানী দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দু'টি অংশকে একত্রে একটি আয়াত বলে পরিগণিত করা হয়েছে। আবার মাদানী দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ) ও (وَتَوَاصَوا بِٱلصَّبْرِ)-কে পৃথক আয়াত হিসাবে গণ্য করা হ'লেও অন্যান্য সকল পদ্ধতিতে এই অংশটিকে একটি আয়াত হিসাবেই ধরা হয়েছে *(ইমাম সাখাভী, জামালুল কুররা ওয়া কামালুল ইকরা ১/৩১৭-৩১৮)।*

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যার মতপার্থক্য কখনোই কুরআনের মূলপাঠের ভিন্নতা বা আয়াত কম-বেশী হওয়ার কারণে হয়নি। বরং তা নানাবিধ কারণে হয়েছে, যা আলোচ্য নিবন্ধে পর্যালোচনা করা হ'ল।

উপসংহার : কুরআনের আয়াত সংখ্যায় ভিন্নতা মূলত গণনার নিয়মে এবং ক্বিরাআতের পার্থক্যের কারণে হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত সংখ্যা হ'ল ৬২৩৬ যা কূফী গণনানুসারে হাফছ ক্বিরাআতের কপি। ৬৬৬৬ সংখ্যাটি দলীলভিত্তিক নয়। বরং লোকমুখে প্রচলিত একটি দুর্বল মত। আয়াত সংখ্যার এই পার্থক্য কুরআনের নির্ভরযোগ্যতা, সংরক্ষণ বা তাওহীদের শিক্ষায় কোন প্রভাব ফেলে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন॥

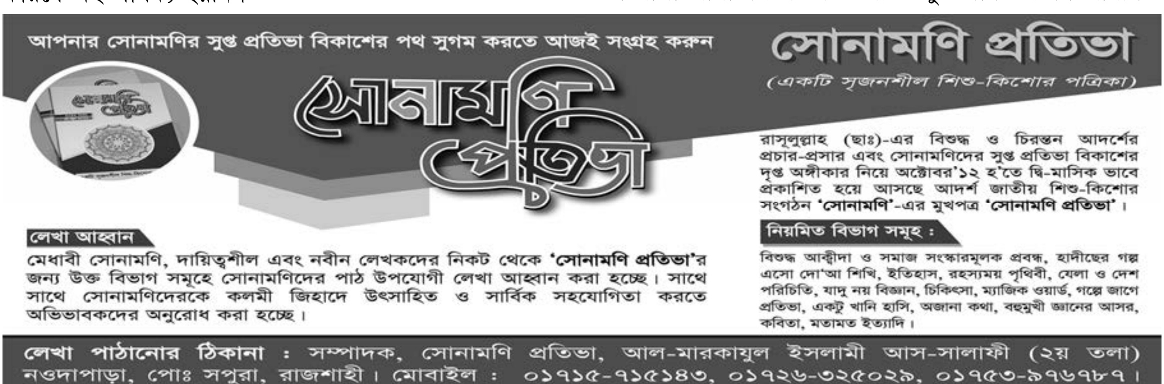

এই নৃশংসতার শেষ কোথায়?

- ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

৯ জুলাই বুধবার। সময় বিকাল ৫টা ৪০ থেকে ৬টা। ঢাকার রাজপথে নৃশংসতার আরো একটি লোমহর্ষক ইতিহাস রচিত হ'ল। পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের (মিটফোর্ড হাসপাতাল) ৩নং গেইট সংলগ্ন এলাকায় ঘটে গেল ইতিহাসের এক জঘন্যতম, বর্বরোচিত ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড। প্রতিহিংসার রাজনীতির পোষ্য, সমাজের বিষাক্ত কীট চাঁদাবাজদের জিঘাংসার নির্মম শিকার হ'লেন নিরীহ ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগ (৩৯)। প্রথমে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে এবং ইট-পাথর দিয়ে আঘাত করে তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশ থেঁতলে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে করা হয় বিবস্ত্র। খুলে ফেলা হয় শর্ট প্যান্ট ছাড়া সবকিছু। এরপর উলঙ্গ দেহটি খোলা আকাশের নীচে বৃষ্টিস্নাত পাকা সড়কে ফেলে একের পর এক পাথর ছুঁড়ে মারা হয় নিথর দেহটির উপর। অতঃপর মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর নিহতের রক্ত নিজের বুকে মেখে উল্লাস করে আসামী আলমগীর। অন্য আসামীরা রক্তাক্ত লাশের উপর মারতে থাকে চড়-থাপ্পড় লাথি। কেউ কেউ বুকের ওপর উঠে করে পৈশাচিক নৃত্য।

এই বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হ'লে মানুষের মধ্যে তীব্র নিন্দা-ঘৃণা ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্তম্ভিত হয়ে পড়ে গোটা জাতি। ঘটনাটি রাতের অন্ধকারের নয়, নয় কোন গোপন আস্তানার, নয় লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি সংগোপনে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা। লোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত মানুষের সামনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, কেউ সেদিন এগিয়ে আসেনি সোহাগের প্রাণ বাঁচাতে। চিৎকার পর্যন্ত করেনি কেউ। খবর দেয়নি ট্রিপল নাইনে ফোন করে পুলিশকেও। সকলেই নির্বাক। যেন নীরব দর্শক হয়ে উপভোগ করেছে নিষ্ঠুরতার এই চূড়ান্ত পর্বটি। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সাহস কি আমাদের এতটাই তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে? মনুষ্যত্ব আজ কোথায়? প্রতিহিংসার রাজনীতি সাধারণ মানুষের অন্তরাত্মাকে কি এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে যে, 'টু' শব্দটি পর্যন্ত করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলেছে। তবে কি জুলাই বিপ্লবের সাহসী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ বছর ঘুরতেই আমরা ভুলতে বসেছি। এটাই কি ছিল জুলাই বিপ্লবের প্রত্যাশা? এক ফ্যাসিবাদ তাড়িয়ে সেখানে নতুন কোন ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসন করার এটা কোন পূর্বাভাস নয়তো? নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন কি এভাবেই ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে?

এ ঘটনায় যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ততার কথা প্রকাশিত হয়েছে। সেকারণ খুনের সাথে জড়িত ৫ জনকে আজীবনের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদের পতনের পর বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রবণতা দেখা দিয়েছে তীব্রভাবে। ভাবখানা এমন যে, তারা ক্ষমতায় এসে গেছে। বিগত সাড়ে পনের বছরের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে অবৈধ দখল, চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে এই দলের একশ্রেণীর নেতা-কর্মী। এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে সর্বত্র। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও তোলপাড়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব নেতাকর্মীর অপকর্মের দায়ভার বিএনপির উপরই বর্তাবে। ইতিমধ্যে নানা অপকর্মে জড়িত দলের প্রায় পাঁচ হাযার নেতাকর্মীকে বহিষ্কারের কথাও তাদের শীর্ষ নেতারা স্বীকার করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে- ঘটনা ঘটার পর সামান্য দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ তুলে দল থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েই কি দায়মুক্ত হওয়া যাবে? এভাবেই কি একটা বড় দলের ইমেজ রক্ষা করা সম্ভব? আর কি কোন করণীয় নেই? নিশ্চয়ই প্রত্যেক এলাকায় দলের কারা কারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, তা তাদের অজানা থাকার কথা নয়। আগে থেকেই কেন এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না? ঘটনা ঘটার পর বহিষ্কার করে কতটুকু ফায়দা? দিন শেষে খেসারত তো দলকেই দিতে হবে।

প্রিয় পাঠক! সেভেন-নাইনের (৭/৯) এই ঘটনা আমাদেরকে নিকট ও দূর অতীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটে যাওয়া আরো কিছু ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঢাকার রাজপথে লগি-বৈঠার তাণ্ডব। সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে ১৪ দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কয়েকজন কর্মী ও সমর্থককে লগি, বৈঠা, লাঠি, পিস্তল ও বোমা হামলা চালিয়ে যেভাবে খুন করেছিল তা মনে হ'লে আজও গা শিউরে ওঠে। সাপের মতো পিটিয়ে মানুষ মেরে সেই লাশের উপর সেদিন তারা নৃত্য করেছিল। যে ঘটনা বিশ্ব বিবেককে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

এর মাত্র ৬ বছর পর ২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বরে পুরান ঢাকার জজকোর্ট এলাকায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আরেক বলি হয় বিশ্বজিৎ দাস নামের একজন নিরীহ দর্জি। ১৮ দলীয় জোটের সরকার বিরোধী অবরোধ কর্মসূচী চলাকালে রাস্তা পার হওয়ার সময় আওয়ামী হায়েনাদের ধাওয়ার মুখে পড়ে বিশ্বজিৎ। দৌড়ে নিকটস্থ ভবনের দোতলায় একটি ডেন্টাল ক্লিনিকে আশ্রয় নেয়। সেখানেই হামলে পড়ে হায়েনারা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রক্তাক্ত হয়ে যায় পুরো দেহ। প্রাণ বাঁচাতে পাশের আরেকটি ভবনে ঢুকে পড়ে। কিন্তু না শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানেও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায় তার উপর। তারপর সেখান থেকে বের করে এনে রাস্তায় আবার নির্যাতন। তার আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারি হ'লেও এই নির্মমতার সম্মুখে সেদিন কেউ এগিয়ে আসেনি। শেষতক চাপাতির কোপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নিরীহ বিশ্বজিৎ। নিষ্ঠুরতা এতটাই সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, তাকে হাসপাতালে পর্যন্ত নিতে দেয়নি এই হায়েনারা। অবশেষে দেহটা যখন ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল তখন একজন রিক্সাওয়ালা তাকে পার্শ্ববর্তী মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করে।

বিশ্বজিৎ হত্যার ৭ বছর পর ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে আরো একটি কলঙ্কিত ঘটনা ঘটে। বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে (২১) রাতভর নির্যাতন করে হত্যা করে তৎকালীন ক্ষমতাশীল দলে ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা। অপরাধ ফেইসবুকে ভারত বিরোধী একটি পোষ্ট। এই ঠুনকো অভিযোগে দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞান বিতরণ কেন্দ্র 'বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়' (বুয়েট)-এর একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে আবাসিক হলের কক্ষে রাতভর নির্মম নির্যাতন করে পিটিয়ে হত্যা করা কতটা নির্দয়, নিষ্ঠুর ও মানবতা বিরোধী তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এ হত্যাকাণ্ডও জাতিকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, আমাদের সমাজে হিংসা-প্রতিহিংসার বিষ কতটা গভীরে প্রোথিত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা মানুষকে কতটা অমানবিক করে তুলতে পারে। আবরারের নিথর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিনও যে নির্লিপ্ততা দেখা গিয়েছিল, তা যেন আজকের সর্বব্যাপী নীরবতারই পূর্বাভাস ছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে- রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কেন বার বার এ রকম লোমহর্ষক, বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে এবং এর শেষ কোথায়?

জবাব: প্রথমত: প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। দলীয় শাসন ব্যবস্থার ফলে যে দল যখন ক্ষমতায় যায় তখন সে দলের কর্মীরা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। হেন অপরাধ নেই যে তারা করে না। তাদের অন্যতম ব্যাকাপ (backup) হচ্ছে তাদের দল ক্ষমতায়। প্রশাসন তাদের হাতের মুঠোয়। কাজেই অপরাধ যত বড়ই হোক, নেতা-নেত্রীরা তো আছেই। এই ভরসায় তারা ক্রমান্বয়ে হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত: বিচারহীনতা ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা। আমাদের দেশে যখন কোন ঘটনা ঘটে তখন তা হাঁক-ডাক ছেড়ে প্রচার করা হয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তোলপাড় হয়। তদন্ত কমিটি, গ্রেফতার সবই হয়। কিন্তু দিন-মাস-বছর পেরিয়ে যখন ঘটনাটি বাসি হয়ে যায় তখন জনগণের স্মৃতি থেকে এটি প্রায় হারিয়ে যায়। এ সুযোগে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায়। অথবা শাস্তি হ'লেও তা লঘু বা গুরু যাই হোক শারঈ নিয়মে জনসমক্ষে হয় না। চার দেয়ালের মধ্যে হয়। ফলে এই অপরাধ ও শাস্তি থেকে কেউ কোন শিক্ষা লাভ করে না। আবার ক্ষমতার দাপটে অনেক বড় বড় অপরাধীকে বিচারের আওতায়ও আনা হয় না।

অপরদিকে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতাও একটি বড় কারণ। বৃটিশদের তৈরী আইনে বিচারকার্যে যে সময়ক্ষেপণ হয় তাতে আর ন্যায়বিচার থাকে না। অনেক সময় বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে রায় কার্যকর হ'তে বাদীর হায়াতও শেষ হয়ে যায়। বোদ্ধা পাঠক সহজেই বুঝবেন যে, অপরাধ সংঘটনের দিন থেকে ১০/১৫ বছর পরে যদি রায় হয় তাতে ভিকটিমের আর কি আসে যায়? বা জাতিরও কি কোন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সেদিকে? ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম ইওয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন (William Ewart Gladstone) যথার্থই বলেছেন যে, Justice delayed is justice denied 'বিলম্বিত বিচার ন্যায়বিচার অস্বীকার করারই নামান্তর'। আর এই দীর্ঘসূত্রিতাই যেন আমাদের দেশের চিরায়ত বিধানে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হ'লে দ্রুত বিচার কার্য শেষ করতে হবে এবং অবশ্যই সব ধরনের প্রভাবের উর্ধ্বে ওঠে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অপরাধীর কোন রাজনৈতিক পরিচয় নয়, অপরাধীকে অপরাধী হিসাবেই চিহ্নিত করতে হবে। আশরাফ-আত্বরাফ তথা সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ নাগরিকের জন্য দ্বিমুখী বিচার করা যাবে না। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হে আরবের নেতারা শুনে রাখো '..যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম' *(বু.মু. মিশকাত হা/৩৬১০)*।

তৃতীয়ত: দেশে শারঈ আইন না থাকা। শারঈ আইন থাকলে চোরের হাত কাটা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে জনসমক্ষে হত্যা, ক্বিছাছ বা জানের বদলে জান ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগ থাকলে এবং তা প্রকাশ্যে সংঘটিত হ'লে জনগণ ভীত হ'ত এবং এ জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। ফলে দেশে অপরাধ প্রবণতা কমে যেত।

চতুর্থত: দ্বীনী জ্ঞান চর্চা না থাকা। আমাদের দেশে মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার দ্বিমুখী ধারার কারণে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা দ্বীন সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞান লাভ করে থাকে। ফলে ইসলামের আইন-বিচার ও শাস্তি সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ থেকে যায়। অপরাধীর দুনিয়াবী ও পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে জানারও প্রয়োজনবোধ করে না। ফলে ধর্মটাই তাদের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়। সেকারণ শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বাধ্যতামুলক করা আবশ্যক।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, দলীয় শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট এই জাতির প্রকৃত মুক্তি নিহিত আছে সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত শাসন ব্যবস্থা তথা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মধ্যে। যে খেলাফত ব্যবস্থার ভিত্তি প্রোথিত আছে আখেরাতের চেতনার উপর। যে ব্যবস্থায় খলীফার জবাবদিহিতা থাকবে স্রেফ আল্লাহ্‌র কাছে। যেখানে সার্বভৌমত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র। বিধান চলবে তাঁর। খলীফা আইন রচনাকারী নন, তিনি হবেন এলাহী আইনের প্রয়োগ বা বাস্তবায়নকারী। যেখানে দলও থাকবে না প্রার্থীও থাকবে না। ক্ষমতার লোভ থাকবে না। দলীয় ক্যাডার বাহিনীর প্রয়োজন হবে না। তাক্বওয়া-পরহেযোগারিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হবেন। ফলে সমাজে মারামারি, হানাহানি, খুন, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, দখলবাণিজ্য কিছুই থাকবে না। নির্মমতার শিকার হয়ে আর কোন মায়ের বুক খালি হবে না, কোন বোন অকালে বিধবা হবে না, পিতা সন্তানহারা হবেন না। আর মযলূমের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারি হবে না। তখন সমাজে জ্ঞান চর্চার প্রতিযোগিতা হবে। জ্ঞানীদের মর্যাদা ও কদর বাড়বে। জ্ঞানীরাই হবে সমাজের কর্ণধার। আল্লাহ আমাদেরকে সে সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!

হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

হুসায়েন (রাঃ)-কে তাবেঈনে ইযামের নছীহত :

বকর ইবনু আব্দুর রহমান ইবনিল হারেছ ইবনে হিশাম আল-মাখযূমী বলেন, হে চাচাত ভাই! আপনি এমন শহরে যাচ্ছেন যেখানে আমীর-ওমরা রয়েছে, যাদের কাছে বায়তুল মালের সম্পদ রয়েছে। তারা দীনার-দিরহামের (টাকার) গোলাম। তাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করি না যে, তারা আপনাকে হত্যা করবে না। যদিও তারা আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অতঃপর তাঁর জন্য তিনি কল্যাণের দো'আ করে চলে গেলেন।[১]

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গও হুসায়েন (রাঃ)-এর কূফা গমনের কথা শুনে তাকে নিবৃত্ত করতে পত্র লেখেন। তন্মধ্যে ইয়াযীদ ইবনুল আ'ছাম ও আহনাফ ইবনু ক্বায়েস উল্লেখ্যযোগ্য।[২]

কূফার উদ্দেশ্যে হুসায়েন (রাঃ)-এর যাত্রা :

এসব অমূল্য উপদেশ হুসায়েন (রাঃ)-এর কূফা গমনের পথে বাধা সৃষ্টিতে কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং যাত্রার ব্যাপারে তাঁর প্রতিজ্ঞাকে আরো দৃঢ় করেছে। তিনি তখন তাঁর বংশধরদের মধ্যে ১৭জনকে মদীনায় ফেরত পাঠান, যারা কূফা গমনে আশংকা প্রকাশ করেছিল। হুসায়েন (রাঃ) সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৬০ হিজরীর ৮ই যিলহজ্জ স্বীয় পরিবার-পরিজন ও কূফার ৬০জন লোক সমভিব্যহারে কূফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হন।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর ধারণা করেন যে, হুসায়েন (রাঃ)-এর মক্কা থেকে কূফা গমনের কারণ হচ্ছে মক্কার গভর্ণর আমর ইবনু সাঈদ ইবনিল আছের ভয়। তখন তিনি গভর্ণরকে অনুরোধ করেন হুসায়েন (রাঃ)-কে নিরাপত্তা দিয়ে পত্র লেখার জন্য। গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন জা'ফরকে বললেন, তুমি যা ইচ্ছা লিখে নিয়ে এস, আমি সীল-স্বাক্ষর দিয়ে দিব। গভর্ণরের নিরাপত্তা পত্রসহ আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর ও ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদকে প্রেরণ করেন। কিন্তু হুসায়েন ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানান।[৪] মক্কার গভর্ণর আমর ইবনু সাঈদ ইবনিল আছ স্বীয় ভ্রাতা ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ইবনিল আছের নেতৃত্বে ৬০ জনের একটি দল প্রেরণ করেন হুসায়েন (রাঃ)-কে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু হুসায়েন (রাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হুসায়েন (রাঃ)-এর কূফার পথে তিন মনযিল অগ্রসর হওয়ার পর খবর শুনে সেখানে গমন করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ? হুসায়েন বললেন, ইরাকে। এ সময় তিনি কূফাবাসীর পত্র বের করে দেখালেন। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে একটা হাদীছ শুনাব যা তোমার পূর্বে অন্য কাউকে শুনাইনি। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে জিব্রীল (আঃ) আসলেন এবং তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কোন একটা বাছাই করে নেওয়ার সুযোগ দিলেন। রাসূল (ছাঃ) আখেরাতকে গ্রহণ করলেন। আর তুমি তাঁরই একাংশ। আল্লাহ্র কসম! আহলে বায়তের কেউ আল্লাহ তাদের জন্য যাতে কল্যাণ রয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু এখতিয়ার করেননি। অতএব তুমি ফিরে যাও। তুমি ইরাকবাসীর গাদ্দারীর কথা অবগত এবং তারা তোমার পিতার সাথে কি আচরণ করেছে সেটাও জান। কিন্তু তিনি ফিরে আসতে অস্বীকার করেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর তার সাথে কোলাকুলি করেন এবং বলেন, হে নিহত ব্যক্তি তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি।[৬]

পথিমধ্যে কবি ফারাযদাক হুসায়নের সাক্ষাৎ পায়। তখন সে তাঁকে সালাম করে বলল, আল্লাহ আপনাকে আপনার প্রার্থিত বিষয় দান করুন এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে কর্তৃত্বাধিকারী করুন। তখন হুসায়েন (রাঃ) তাকে লোকজনের মনোভাব এবং তার দেখে আসা অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন। কবি ফারাযদাক বললেন, মানুষের মন-প্রাণ আপনার সাথে আর তরবারিসমূহ বনী উমাইয়ার সাথে। আর চূড়ান্ত ফায়ছালা তো আসবে আসমান থেকে, আর আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। পূর্বাপর সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব আল্লাহ্র, তিনি যা ইচ্ছা করেন। প্রতিদিন আমাদের প্রতিপালক গুরুত্বপূর্ণ ও নিত্য নতুন দায়িত্বে রত। যদি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভাগ্য বিধান অবতীর্ণ হয় তাহ'লে আমরা আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করব। আর শোকর আদায়ের জন্য তিনিই সাহায্যের স্থল। আর যদি আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার পথে ভাগ্য অন্তরায় হয়, তাহ'লে যার নিয়ত ও ইচ্ছা সৎ এবং যার গোপনীয় বিষয় তাক্বওয়া ও আল্লাহভীরুতা, সে সীমালঙ্ঘনকারী নয়। তারপর হুসায়েন (রাঃ) তাঁর বাহনকে নাড়া দিয়ে বললেন, আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ! এরপর পৃথক হয়ে গেলেন।[৭]

এদিকে কূফাবাসী মুসলিম বিন আক্বীলের সাথে গাদ্দারী করে। মুসলিম বিন আক্বীল উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকটে নীত হন। তাকে হত্যার পূর্বে ইবনু যিয়াদ অছিয়ত করার সুযোগ দেন। ওমর ইবনু সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছকে মুসলিম বিন আক্বীল-এর পক্ষ থেকে হুসায়েন (রাঃ)-এর প্রতি তাকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে একটি পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি একটি লোকের মাধ্যমে হুসায়েন (রাঃ)-কে পত্র লেখেন যে, কূফাবাসী প্রতারণা করেছে। সে

১. *আনসাবুল আশরাফ ৩/১৬১; তাবারী ৫/৩৮২ পৃঃ।*
২. *আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ১৪৪।*
৩. *আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ১৪৪-৪৫।*
৪. *আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ১৪৬।*
৫. *আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ১৫০।*
৬. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯২৯; তাহযীবুল কামাল ৬/৪১৬ পৃঃ।*
৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৯/২৬৬।*

পত্রে তিনি মুসলিম বিন আক্বীলের প্রসিদ্ধ বক্তব্য উল্লেখ করেন, ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي، 'আপনি পরিবার নিয়ে ফিরে যান। কূফাবাসী যেন আপনাকে প্রতারিত না করে। কারণ কূফাবাসী আপনাকে ও আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। আর মিথ্যাবাদীর কোন সিদ্ধান্ত (দানের অধিকার) নেই'।[৮]

এদিকে ক্বায়স বিন মুসহির আছ-ছায়দাবী হুসায়নের পত্র নিয়ে কূফায় রওনা হ'লেন, তিনি যখন ক্বাদেসিইয়াতে পৌঁছলেন। তখন আল-হুসায়েন বিন নুমায়র তাকে বন্দী করে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দিল। ইবনু যিয়াদ তাঁকে বলল, প্রাসাদের চূড়ায় আরোহণ কর তারপর মিথ্যুকের পুত্র মিথ্যুক আলী বিন আবূ তালিব এবং তার পুত্র হুসায়েনকে গালি দাও। তখন তিনি সেখানে আরোহণ করে হামদ ও ছানা পড়লেন, তারপর লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে লোকসকল! এই হুসায়েন বিন আলী হ'লেন, আল্লাহ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাখলূক। তিনি হ'লেন রাসূলুল্লাহর কন্যা ফাতিমার পুত্র। আর আমি তোমাদের কাছে তাঁর প্রেরিত দূত। আমি 'যুর-রুম্মাহ' উপত্যকার 'হাজের' নামক স্থানে তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁর কথা শোন ও তাঁর আনুগত্য কর।

এরপর তিন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ও তাঁর পিতাকে লা'নত করলেন আর আলী ও হুসায়েনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর ইবনু যিয়াদের নির্দেশে তাঁকে প্রাসাদের চূড়া থেকে ফেলে দেওয়া হ'ল এবং তাঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। কারো মতে, তাঁর হাড়গোড় সব ভেঙ্গে প্রাণের শেষ অংশ রয়ে গিয়েছিল, তখন আব্দুল মালিক বিন ওমর আল-বাজালী গিয়ে তাঁকে যবহ করল এবং বলল, আমি তাঁকে যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছি। কারণ এই ব্যক্তি আব্দুল মালিক বিন উমায়র নয়, তার মত দেখতে এক ব্যক্তি। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হুসায়নের পত্র নিয়ে যিনি আগমন করেছিলেন, তিনি হ'লেন, তাঁর দুধ ভাই আবদুল্লাহ বিন বাক্তার। এরপর তাঁকেই প্রাসাদ-চূড়া থেকে ফেলে দেয়া হয়।[৯] এদিকে হুসায়েন (রাঃ) কূফাভিমুখে অগ্রসর হ'লেন, অথচ তিনি এসময়ের মাঝে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাই জানতেন না।

কারাবালার মর্মান্তিক ঘটনা :

হুসায়েন (রাঃ) যখন 'বারাফ'[১০] নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলেন। তখন রাতের শেষ প্রহরে তাঁর সঙ্গীদের বলেন, তোমরা যত বেশী পার পানি সংগ্রহ করে নাও। অতঃপর সারা রাত চলে তারা 'যূ হাসান' পৌঁছে যাত্রাবিরতি করেন এবং সেখানে তাঁবুসমূহ খাটান। এরপর হুর বিন ইয়াযীদ আত-তামীমীর নেতৃত্বে এক হাযার অশ্বারোহীর যোদ্ধা দল এসে হাযির হ'ল। এরা ছিল ইবনু যিয়াদের প্রেরিত বাহিনীর অগ্রবর্তী দল। হুসায়েন (রাঃ) সবার সামনে কূফাবাসীদের পত্র ও তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। তখন হুর তাঁকে বলল, আমরা জানি না এই সকল পত্র কী এবং কারা তা দিয়েছে। আপনার কাছে যারা পত্র লিখেছে তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনার সাক্ষাৎ পাওয়ার পর থেকে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে আপনাকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা যেন আপনার পিছু না ছাড়ি। তখন হুসায়েন (রাঃ) বললেন, এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। হুর তাঁকে বলল, আমাকে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কূফায় ইবনু যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে আপনার পিছু না ছাড়তে। আপনি তার কাছে যেতে না চান তাহ'লে কূফা ও মদীনার পথ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ অবলম্বন করুন। হুর-এর এ পরামর্শের পর হুসায়েন (রাঃ) আল-উযায়র ও আল-ক্বাদিসিয়্যার পথ ছেড়ে বাম দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

এদিকে ইবনু যিয়াদ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন ১. হুসায়েন (রাঃ) ও কূফাবাসীর মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া, ২. কূফায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, ৩. সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং নেতাদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা। এরপর সে হুছায়ন বিন তামীম আত-তাহ্বীকে ক্বাদেসিয়াতে পাঠায়। সে ক্বাদেসিয়া হ'তে খাফান ও ক্বাদেসিয়া হ'তে ক্বাতক্বাতান ও লা'লা'-এর মধ্যবর্তী পথ বন্ধ করে দেয়। সেই সাথে ওয়াক্বিছা হয়ে সিরিয়ার পথে এবং বছরার পথে কাউকে প্রবেশ বা বের হ'তে না দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কেউ জোর করে অতিক্রম করতে চাইলে তাকে বন্দী করার আদেশ দেয়। হুসায়েন (রাঃ) প্রেরিত দূত ক্বায়েস বিন মিসহার ও আব্দুল্লাহ ইবনু বাকত্বারকে ইবনু যিয়াদ হত্যা করে। ফলে মানুষের মাঝে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, হুসায়েন (রাঃ)-এর পক্ষ যে নিবে তার পরিণতি হবে মৃত্যু। হুসায়েন (রাঃ) যাবালাহ মতান্তরে শারাফ পৌঁছে মুসলিম বিন আক্বীল, হানী বিন উরওয়াহ ও আব্দুল্লাহ বিন বাক্বতারের মৃত্যু এবং কূফাবাসীর সাহায্য বিমুখ হওয়ার খবর অবগত হন।

অবশেষে হুসায়েন (রাঃ) কারবালা পৌঁছেন এবং ওমর ইবনু সা'দ, শিমার বিন যিল জাওশান ও হুছাইন বিন তামীমের সাক্ষাৎ পান। ওমর বিন সা'দ ৪ হাযার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি হুসায়েন (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে না চাইলে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাকে তার পদ থেকে অপসারণের হুমকি দেয় এবং হত্যার ভয় দেখায়। তখন তিনি (নিরুপায় হয়ে) হুসায়নের বিরুদ্ধে অভিযানে রওনা হন।

সেনাপতি ওমর বিন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত হুসায়েন (রাঃ)-এর প্রেরিত তিনটি আপোষ প্রস্তাব গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ খলীফা ইয়াযীদ বিন

৮. আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ১৪৯-৫০।
৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৯/২৬৬।
১০. আত-তাবারী ৬/২২৬; এর অবস্থান হ'ল ওয়াকিছাহ ও আল- কারআ-এর মধ্যবর্তী, বনূ ওয়াহবের বাসস্থল আল-আহসা থেকে ৮ মাইল দূরে ও শারাফ থেকে ওয়াকিছার দূরত্ব ২ মাইল। দ্রঃ মু'জামুল বুলদান।

মু'আবিয়া-র নিকট পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর হৃদয় শিমার বিন যুল-জওশান তাকে সরোষে বলল, কখনোই না। প্রথমে তিনি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করবেন'। একথা মেনে নিয়ে ইবনু যিয়াদ উক্ত নির্দেশ পালনের জন্য হুসায়েন (রাঃ)-এর নিকট সরাসরি শিমারকে পাঠান। তাকে বলা হয়, সেনাপতি ওমর বিন সা'দ যদি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইতস্তত করেন, তাহ'লে তুমি তার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং হুসায়েনকে হত্যা করবে'।[১১] হুসায়েন (রাঃ) উক্ত হীনকর প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করলে শিমারের নির্দেশে যুর'আ বিন শারীক তামীমী প্রথমে তাঁকে তরবারীর আঘাতে ভূপাতিত করে। অতঃপর সিনান বিন আনাস নাখাঈ তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। অতঃপর সে তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে। উল্লেখ্য যে, সেনাপতি ওমর-এর পিতা সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)-এর ন্যায় শিমারের পিতাও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। বলা হয়েছে যে, তাঁর অপর নাম শুরাহবীল।[১২] ঐদিন ছিল ১০ই মুহাররম শুক্রবার। যদিও কেউ কেউ বলেছেন, ওটা ছিল ছফর মাস। তবে প্রথমটিই সঠিক।[১৩]

হুসায়েন (রাঃ)-এর মৃত্যু :

হুসায়েন (রাঃ) ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররম আশূরার দিন জুম'আ বারে ৫৪ বছর ৬ মাস ১৫ দিন বয়সে কারবালা প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেন।[১৪]

নিহতদের সংখ্যা ও তালিকা :

হুসায়েন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ (রাঃ) বলেন, 'হুসায়েন সহ এদিন তাঁর পরিবারের ১৭ জন পুরুষ সদস্য নিহত হন। যাদের মধ্যে ৫ জন হুসায়েন (রাঃ)-এর ভাই- আব্বাস, জা'ফর, আব্দুল্লাহ, ওছমান ও মুহাম্মাদ আল-আছগার। হুসায়েন (রাঃ)-এর দুই পুত্র আলী আল-আকবার ও আব্দুল্লাহ। বড় ভাই হাসান (রাঃ)-এর তিন পুত্র আব্দুল্লাহ, ক্বাসেম ও আবুবকর। আক্বীলের ৩ পুত্র জা'ফর, আব্দুর রহমান ও আব্দুল্লাহ। মুসলিম বিন আক্বীলের ২ পুত্র আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবনু আবী সাঈদ ইবনে আক্বীল। আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর ইবনে আবী তালেবের ২ পুত্র আওন ও মুহাম্মাদ।[১৫] আহলে বায়েতের ১৭ জন ছাড়াও ঐদিন হুসায়েন পক্ষে নিহত হন ৭২ জন এবং বিপক্ষে নিহত হয় ৮৮ জন। যাদের সবাইকে কারবালা ময়দানে দাফন করে বনূ আসাদ গোত্রের লোকেরা।[১৬] তবে ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, আলী আল-আকবার হুসায়েন-এর কোলে শহীদ হন। ইনি আব্দুল্লাহ আর-রাযী' (দুগ্ধপোষ্য আব্দুল্লাহ) নামে পরিচিত।[১৭] যদিও শী'আরা হুসায়েনের কোলে নিহত হওয়া শিশুপুত্রকে আলী আল-আছগার বলে থাকে।

ইয়াযীদের প্রতিক্রিয়া :

হুসায়েন (রাঃ)-এর নিহত হওয়ার খবর রাজধানী দামেস্কে পৌঁছলে ইয়াযীদ ও তার পরিবার অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তারা ক্রন্দন করতে থাকেন। এ সময় ইয়াযীদ বলেন, لَعَنَ اللهُ ابْنَ مَرْجَانَةَ يَعْنِىْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ، أَمَا وَاللهِ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُسَيْنِ رَحِمٌ لَمَا قَتَلَهُ وَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَرْضَى مِنْ طَاعَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِدُوْنِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ- 'ইবনু মারজানার (ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের) উপর আল্লাহ লা'নত করুন! আল্লাহর কসম যদি হুসায়েনের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কখনোই তাঁকে হত্যা করত না'। তিনি বলেন, 'হুসায়েনের খুন ছাড়াই আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম'।[১৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইয়াযীদ আরও বলেন, 'ইবনু যিয়াদের উপর আল্লাহ লা'নত করুন! সে হুসায়েনকে কোনঠাসা ও বাধ্য করেছে। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন অথবা আমার নিকটে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে হত্যা করেছে। এর ফলে সে আমাকে মুসলমানদের বিদ্বেষের শিকারে পরিণত করেছে। তাদের হৃদয়ে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ বপন করেছে। ভাল ও মন্দ সকল প্রকারের লোক হুসায়েন হত্যার মহা অপরাধে আমাকে দায়ী করবে ও আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। হায়! আমার কি হবে ও ইবনু মারজানার (ইবনে যিয়াদের) কি হবে! আল্লাহ তাকে মন্দ করুন ও তার উপরে গযব নাযিল করুন'![১৯]

হুসায়েন পরিবারের স্ত্রী-কন্যা ও শিশুগণ ইয়াযীদের প্রাসাদে প্রবেশ করলে প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। ইয়াযীদ তাদেরকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন ও মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সসম্মানে মদীনায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।[২০] যে তিন দিন হুসায়েন পরিবার ইয়াযীদের প্রাসাদে ছিলেন, সে তিন দিন সকালে ও সন্ধ্যায় হুসায়েনের দুই ছেলে আলী (ওরফে 'যয়নুল আবেদীন') এবং ওমর বিন হুসায়েনকে সাথে নিয়ে ইয়াযীদ খানাপিনা করতেন ও আদর-সোহাগ করতেন'।[২১]

হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতে আহলে সুন্নাতের অবস্থান :

হুসায়েন (রাঃ) সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের অবস্থান এই যে, খেলাফতের হকদার হিসাবে হুসায়েন ও তাঁর অনুসারীদের দাবী নিঃসন্দেহে সঠিক থাকলেও সবকিছুর উপরে আল্লাহ্র অমোঘ বিধানই কার্যকর হয়েছে। আর তাহ'ল, আল্লাহ্র

---

১১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১৭২।
১২. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১৯০।
১৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১৭৩, ২০০।
১৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১৬০ পৃঃ।
১৫. আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ১৬৭।
১৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১৯১।
১৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩২১।

১৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ (রিয়ায : মাকতাবাতুল কাওছার ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.) ১/৩৫০ পৃ.।
১৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/২৩৫।
২০. মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ ১/৩৫০।
২১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১৯৭।

বাণী- قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- 'তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি রাজাধিরাজ। তুমি যাকে খুশী রাজত্ব দান কর ও যার কাছ থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে খুশী সম্মানিত কর ও যাকে খুশী অপমানিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ- 'বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ (স্বীয় অনুগ্রহ) প্রশস্তকারী ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৪৭)*। বস্তুতঃ ইয়াযীদও কাছাকাছি একই কথা বলেছিলেন।[২২]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হুসায়েন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে বাড়াবাড়ি করে শী'আদের ন্যায় ঐদিন শোক দিবস পালন করে না। দুঃখ প্রকাশের ইসলামী রীতি হ'ল 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন' পাঠ করা *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)* ও মাইয়েতের জন্য দো'আ করা।

মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় খলীফা ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাত আদায়রত অবস্থায় মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে পরে শাহাদত বরণ করেছেন। ওছমান গণী (রাঃ) ৮৩ বছরের বৃদ্ধ বয়সে নিজ গৃহে কুরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় পরিবারবর্গের সামনে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ হয়েছেন। আলী (রাঃ) ফজরের জামা'আতে মসজিদে যাওয়ার পথে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে তাঁর হত্যাকারী এবং বিরোধীরা 'কাফের' ও 'আল্লাহ্র নিকৃষ্টতম সৃষ্টি' বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।[২৩] যদিও হোসায়েন (রাঃ)-কে তাঁর হত্যাকারীরা কখনো 'কাফের' বলেনি।

আশারায়ে মুবাশশারাহ্র অন্যতম ব্যক্তিত্ব ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ) 'উটের যুদ্ধে' মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন। তাঁদের কারো মৃত্যু হুসায়েন (রাঃ)-এর মৃত্যুর চাইতে কম দুঃখজনক ও কম শোকাবহ ছিল না। কিন্তু কারো জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করে মাতম করার ও শোক দিবস পালন করার কোন রীতি কোন কালে ছিল না। ইসলামী শরী'আতে এগুলি নিষিদ্ধ।

রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী :

উম্মুল ফাযল বিনতুল হারেছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে প্রবেশ করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন, সেটা কি? রাবী বললেন, সে অত্যন্ত কঠিন (স্বপ্ন)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটা কি? উম্মু ফাযল বলেন, আমি দেখলাম, আপনার দেহের একটা অংশ আমার ক্রোড়ে রাখা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ভাল দেখেছ। ফাতিমা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে ইনশাআল্লাহ, তাকে তোমার কোলে দেওয়া হবে। অতঃপর ফাতেমা (রাঃ) হুসায়েনকে প্রসব করলেন। সে আমার কোলে ছিল যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন। একদিন হুসায়েনকে কোলে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর কোলে হুসায়েনকে দিলাম। অতঃপর ফিরে আসার সময় আমি রাসূল (ছাঃ)-কে অশ্রুসিক্ত দেখে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমার নিকটে জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে সংবাদ দিল যে, আপনার উম্মত অচিরেই আপনার এই দৌহিত্র হুসায়েনকে হত্যা করবে। আমি বললাম, একে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আমার জন্য সেখানকার লাল মাটি নিয়ে আসলেন'।[২৪] আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرَى النَّائِمُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ قَائِمٌ أَشْعَثَ أَغْبَرَ بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ. فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدُوهُ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘুমন্ত লোক যেভাবে কিছু দেখে, সেভাবে আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দ্বিপ্রহরে স্বপ্নে দেখলাম। তখন তিনি ছিলেন এলোমেলো ও চেহারায় ধূলি মাখা অবস্থায়। তাঁর হাতে ছিল রক্তে পরিপূর্ণ একটি শিশি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোন। এটা কি? তিনি বললেন, এটা হুসায়েন ও তার সাথীদের রক্ত, যা আমি আজকের দিন অত্র শিশিতে উঠিয়ে রাখছি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, স্বপ্নের ঐ সময়টি আমি স্মরণে রাখি। পরে দেখতে পেলাম, হুসায়েন ঠিক সে সময়েই নিহত হয়েছেন'।[২৫]

পরিশেষে বলব, কারবালায় হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদত ছিল এক অনাকাঙ্খিত ঘটনা। এই ময়দানে তাঁর শাহাদত নির্ধারিত ছিল বলেই তিনি ছাহাবী-তাবেঈগণের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কূফায় গমন করেন। তাঁর শাহাদতকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের বিভ্রান্তি মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে। এগুলি পরিহার করা কর্তব্য। তেমনি কারবালার ঘটনাকে হক-বাতিলের যুদ্ধ আখ্যায়িত করাও সঠিক নয়। হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতের স্মরণে বর্তমানে যেমন তা'যিয়া মিছিল করা হয় সেটাও ইসলামে সিদ্ধ নয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

২২. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১৯৭।*
২৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৩৩৯।*
২৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮২১, সনদ ছহীহ।*
২৫. *আহমাদ হা/২৫৫৩; বায়হাক্বী ৬/৪৭১; মুসনাদে আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭১০; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১২৬৬৬; হাকিম হা/৮২০১।*

আল-হামরা : হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণ যুগের নীরব সাক্ষী

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

প্রাচীন আইবেরিয়ান উপদ্বীপ রাষ্ট্র স্পেনের আন্দালুস বিজয়ের মাধ্যমে রোমান সভ্যতার ধ্বজাধারী ইউরোপ মহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রোথিত হয়। উমাইয়া খলীফার তরুণ বীর সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ (মৃ. ৭২০ খৃ.) নৌবহর নিয়ে মরক্কো থেকে আফ্রিকা ও ইউরোপকে বিচ্ছিন্নকারী জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেন জয় করেন। আফ্রিকা বিজয়ী বীর মূসা বিন নুসাইর (মৃ. ৭১৬ খৃ.) ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ৩০০ আরব ও ৭ হাযার বার্বার সেনার বহর তুলে দেন সেনাপতি তারেকের হাতে। তারিক ৪টি জাহাজে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একটি পাহাড়ে অবতরণ করেন যা আজও জাবালুত তারিক (তারিক পাহাড়) নামে খ্যাত। রাতের শেষ ভাগে অভিযান শুরু হয়। তারিক স্পেনের মাটিতে ফজরের ছালাত আদায় করেন।[১]

ঐতিহাসিকদের মতে, তারিক স্পেনের উপকূলে পদার্পণ করে সমস্ত জাহাজ পুড়িয়ে ফেলেন। তারপর সৈন্যদের সামনে তেজস্বী কণ্ঠে উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণ দিয়ে বলেন, ‘ভাইসব! পেছনে বিশাল সমুদ্র, সামনে শত্রু বাহিনী। আমি জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। ফিরে যাবার কোন পথ নেই। আমরা ফিরে যেতে এখানে আসিনি। এই ভূমিকে আমাদের স্বদেশভূমিতে পরিণত করতে এসেছি।...আমরা হয় গাযী হব নয়তো শহীদ’।[২] তারেকের এই তেজোদীপ্ত ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে সৈন্যরা জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে। মাত্র ১২ হাযার (৫ হাযার সৈন্য পরে যুক্ত হয়) মুজাহিদের বিপরীতে স্পেনের রাজা রডারিক ১ লক্ষ্য সেনাবাহিনী জমায়েত করে। তবুও মুজাহিদদের মাথার সাদা পাগড়ী, শরীরে লোহার বর্ম, হাতে আরব ধনুক, কোমরে বর্শা ও তরবারী দেখে রডারিক ভয়ে কাঁপতে থাকে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মে। লক্ষাধিক সৈন্যের সাথে ৭ দিনের অসম লড়াইয়ে ৩ হাযার শহীদের আত্মত্যাগে স্পেন মুসলমানদের করতলগত হয়।[৩]

ফলে মুসলমানদের জন্য ইউরোপের দুয়ার উন্মুক্ত হয়। দলে দলে লোকজন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ইসলামী সাম্রাজ্য স্পেন ছাড়িয়ে ফ্রান্সে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় উত্তরে পীরেনীজ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলমানগণ ৭১১ থেকে ১৪৯২ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৭০০ বছরের অধিককাল এ অঞ্চল শাসন করে। কিন্তু শাসকদের দুর্বলতা, পারস্পরিক আত্মকলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, বিলাস-ব্যসন এবং ক্ষমতা হারানো খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের ফলে স্পেনে ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। মুসলমানদের বিজিত ভূমি থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর অসভ্যতায় জর্জরিত সমাজকে মুসলমানগণ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস, চিকিৎসা ও নৈপুণ্যশৈলীতে নির্মিত স্থাপত্যে বাগদাদের পাশাপাশি স্পেনকে করে তুলেছিলেন দীপ্তিময়।

মুসলমানদের সেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত সোনালী ইতিহাসকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে খ্রিস্টানরা। কর্ডোভায় প্রতিষ্ঠিত অনিন্দ্যসুন্দর কর্ডোভা জামে মসজিদকে গির্জায় পরিণত করে। যে মসজিদে এক সময় শুধু বাতি জ্বলত ১০ হাযার আর খাদেম ছিল ৩০০ জন! মসজিদ সংলগ্ন কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়, গ্রন্থাগারগুলোতে সংরক্ষিত লক্ষ লক্ষ দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। বিভিন্ন প্রাসাদের আরবী লিপি, পাথরে খোদিত আরবী শিলালিপি এমনকি কারুশিল্পের সামান্যতম নিদর্শনাদিও ধ্বংস করতে ছাড়েনি তারা। শত নির্যাতন আর ধ্বংসযজ্ঞের পরেও ইসলামী সভ্যতার নিদর্শন এখনো স্পেনসহ সমগ্র ইউরোপে রবি রশ্মির ন্যায় বিকিরিত হচ্ছে।

তেমনি এক মুক্তা খচিত পান্না গ্রানাডার সাবিকা পাহাড়ে অবস্থিত আল-হামরা প্রাসাদ। স্পেন এক সময় উমাইয়া খেলাফতের অধিনতা থেকে মুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। ১৩শ শতকে বনু নাছর বংশের প্রধান মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-আহমার (মৃ. ১২৭২ খৃ.) গ্রানাডা দখল পূর্বক রাজধানী কায়েম করে নাছরী বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই সবুজে ঘেরা সাবিকা পাহাড়ের চূড়ায় রোমান দুর্গের ধ্বংসস্তূপের উপর পৃথিবী বিখ্যাত লাল প্রাসাদ আল-হামরা নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর বংশধরগণ এই প্রাসাদ সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বর্ধন করে। আড়াই শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে আল-হামরা প্রাসাদ হৃদয়গ্রাহী মুগ্ধকর শৈল্পিক স্থাপত্যরূপে গড়ে ওঠে। প্রাসাদের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দারো নদী। সুলতান মুহাম্মাদ সে সময় দারো নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে নলের সাহায্যে প্রাসাদে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। দুর্লভ বৃক্ষ ও সুগন্ধি ফুল দ্বারা উদ্যান সুশোভিত করেছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের বড় একটি অংশ সেই বাগানে কাটাতেন।

পুরো প্রাসাদে বাথরুম থেকে শুরু করে ফুলের বাগান পর্যন্ত পাহাড় থেকে আনা পানির ধারা ছড়িয়ে আছে। সেই পানিই শহরের দিকে নেমে গিয়ে ঝর্ণা ও খাল বেয়ে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণের উষ্ণ আবহাওয়ায় রয়েছে প্রাণ জুড়নো পাহাড়ী বাতাস, পানির মর্মর ধ্বনি, সবুজ গাছপালা আর প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রত্যেককে অলস প্রশান্তি এনে দিবে।[৪]

আল-হামরার যে অবকাঠামো অদ্যাবধি স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে সেটা নির্মাণের কৃতিত্ব সুলতান প্রথম ইউসুফ (মৃ. ১৩৫৪ খৃ.) ও পঞ্চম মুহাম্মাদের (মৃ. ১৩৫৯ খৃ.)। তাঁদের হাত ধরেই এই শহর বিস্তৃত হয়, অনেক মসজিদ,

---

১. মোঃ আবু তাহের, মুসলিম স্পেন : রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী ২০২০), পৃ. ২১।

২. ড. আলী মুহাম্মাদ ছাল্লাবী, আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যাহ: আওয়ামিলুল ইযদিহার ওয়া তাদা'ইয়াতুল ইনহিয়ার, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল মা'রেফা, ২য় প্রকাশ, ১৪২৯হি./২০০৮খৃ.), পৃ. ২৭।

৩. আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যাহ, পৃ. ২৪-২৫।

৪. Washington Irving, Tales of The Alhambra (London : Richard Bentley, 8. New Burlington Street, 1835), p. 25.

হাম্মামখানা এবং অতুলনীয় অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়। আল-হামরার দৈর্ঘ্য ২৪৩০ ফুট এবং প্রস্থ গড়ে ৬০০ ফুট। প্রায় ১৫ লাখ ৩০ হাযার বর্গফুট এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এ প্রাসাদ উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত।[৫] ১৭৩০ মিটার দেয়াল ঘেরা শহরের ভেতরে রয়েছে ত্রিশটি টাওয়ার আর চারটি সদর দরজা। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল বিশাল টাওয়ার সদৃশ 'গেইট অব জাস্টিস' বা ন্যায়ের দরজা। যেখানে মুসলিম আমলে বিচারসভা বসত এবং ছোট-খাটো মামলার তাৎক্ষণিক বিচার হ'ত।[৬] আল-হামরায় চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত বিখ্যাত তিনটি স্থাপনা যথাক্রমে কোমারিস প্যালেস, কোর্ট অব লায়ন ও পার্টাল প্যালেস রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোমারেস প্যালেস সবচেয়ে উঁচু। এই প্যালেসের সদর দরজাটি উন্মুক্ত হয়েছে একটি প্রাঙ্গনে যেখানে রয়েছে বিশাল চত্বর ও পুকুর। এই প্যালেসের অভ্যন্তরেই রয়েছে সুলতানদের সিংহাসন কক্ষ 'হল অব অ্যাম্বেসেডরস'। কোমারিস প্রাসাদের পরেই চমৎকার পানিপ্রাবাহ সম্বলিত মার্বেল বেসিন বসানো রয়েছে পাথরে খোদাই করা বারোটি সিংহের পেছনে যাকে 'কোর্ট অব লায়ন' বলা হয়।

আল-হামরার প্রাসাদসমূহের জটিল ও সূক্ষ্ম স্থাপত্যশৈলী তাকে করেছে এক অভূতপূর্ব নান্দনিকতার প্রতীক। প্রতিটি কক্ষেই রয়েছে প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস প্রবাহের সুব্যবস্থা। প্রাসাদজুড়ে ছড়িয়ে আছে অগণিত স্তম্ভ, ঝর্ণা, তোরণ, স্বচ্ছ পুকুর, রঙিন ফুলগাছ ও ঝকঝকে ফোয়ারা। মার্বেল পাথরে খোদাই করা নিখুঁত কারুকাজ, দেয়ালের জ্যামিতিক অলঙ্করণ, মাকার্নাস নকশার গম্বুজাকার কারুকার্যখচিত কাঠের সিলিং, রঙিন টাইলস ও মোজাইক, গাণিতিক নকশা, ফুল পাতার জড়াজড়ি করা আরবী অ্যারাবেস্ক শৈলী এবং নানাবর্ণে রচিত আলপনার অনুপম সৌন্দর্য আল-হামরাকে করে তুলেছিল স্থাপত্যকলার এক অতুলনীয় নিদর্শনরূপে। সেজন্য পর্যটক জাসন ওয়েবস্টার লিখেছেন, 'কিশোররা পর্যন্ত আল-হামরার মার্বেলওয়ালা মেঝে ও উপরের স্তম্ভের মাথায় জটিল জ্যামিতিক নকশা দেখে হতবাক হয়ে পড়ে।...আমি প্রাসাদে যেতে 'কুয়েস্টা ডি গোমেরেজ' (ইসলামী নাম ছিল বাবুল বুখসার) এলাকা পর্যন্ত কমপক্ষে ডজন খানেক হেঁটেছি কিন্তু প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে আজকেই প্রথম আসলাম'।[৭]

প্রাসাদের অভ্যন্তরের দেয়াল, কক্ষ, খুঁটি ও মিনারসমূহ অলঙ্কৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীছ, উপদেশমূলক বাণী, আরবী ক্যালিগ্রাফি এবং আন্দালুসের খ্যাতিমান কবি ইবনুল খতীব (মৃ. ১৩৭৪ খ্রি.) ও ইবনু জামরাক (মৃ. ১৩৯৩ খ্রি.)-এর মনোমুগ্ধকর কবিতার শ্লোক দ্বারা। দরবার কক্ষগুলোর বিভিন্ন স্থান জুড়ে রয়েছে আল-আহমারের বিখ্যাত সেই উক্তি ولا غالب إلا الله তথা 'আল্লাহ ছাড়া কেউ বিজয়ী নয়'। কাস্টাইলের খ্রিস্টান রাজা ফার্দিনান্দ স্পেন থেকে ইসলাম ও মুসলমানকে বিতাড়িত করার ঘৃণ্য মানসিকতায় গ্রানাডায় আহমারকে কখনো সুখে থাকতে দেয়নি। তিনি ১২৪৬ সালে জায়েন শহর আক্রমণ করেছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে আহমার ফার্দিনান্দের অধিনস্ত রাজা হিসাবে রাজ্য পরিচালনার সন্ধি করেন। তিনি অসম্মানিত হন, জায়েনের একচ্ছত্র অধিকার থেকে বঞ্চিত হন এমনকি ফার্দিনান্দকে ভবিষ্যতে সামরিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিতে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে কিছুদিন পরেই ফার্দিনান্দ অপর মুসলিম শহর সেভিল আক্রমণ করে আহমারের সহায়তা চান। নিরুপায় আহমার নির্বাচিত ৫০০ দক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে তাঁরই মুসলিম ভাইদের বিপক্ষে খ্রিস্টান রাজার অনুগত হয়ে অভিযানে অংশ নেন। ১২৪৮ সালে সেভিলের পতন হয়। আহমার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে গ্রানাডায় প্রবেশ করছিলেন। যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ায় সাধারণ জনগণ তাঁকে 'আল-গালিব' তথা বিজয়ী বলে প্রশংসা করছিল। আর তিনি বিমর্ষ চিত্তে মৃদু মাথা নেড়ে বলেছিলেন ولا غالب إلا الله। তারপরেই তিনি আল-হামরা প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন।[৮]

ইসলামী সাম্রাজ্য হারানোর আত্মগ্লানির বেদনাবিধুর অব্যক্ত স্মৃতি মুসলমানদের চরম পরিণতির সাক্ষ্য হিসাবে যুগ-যুগান্তর ধরে দেখানোর জন্যই হয়তো তিনি আল-হামরার দেওয়ালে বিখ্যাত এই উক্তি পাথরে খোদাই করে রেখেছিলেন। ১৪৯২ সালে সুলতান আবু আব্দুল্লাহ বোয়াবদিল (মৃ. ১৫৫৩ খৃ.)-এর শাসনকালে গ্রানাডার পতনের মাধ্যমে সমগ্র স্পেন থেকে ইসলামী শাসনের জ্বলন্ত প্রদীপ দপ করে নিভে যায়। নিপুণ কারিগরদের হাতে গড়া শত শত বছরের পরিশ্রমে তৈরী ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদের চাবি তুলে দিতে হয় খ্রিস্টানদের হাতে। সুলতান আবু আব্দুল্লাহ অ্যারাগণের খ্রিস্টান রাজা ফার্দিনান্ডের হাতে আল-হামরার চাবি তুলে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে উঁচুনিচু পথে অদৃশ্য হওয়ার আগে আল-হামরাকে শেষবারের মত দেখার জন্য অশ্বের গতিরোধ করেন। পেছন ফিরে আল-হামরার দিকে তাকিয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন আর চোখের পানি মুছছিলেন। তখন তাঁর মা আয়েশা তাকে তিরস্কার করে বলেন, 'যে সম্পদ তুমি পুরুষের মত রক্ষা করতে পারোনি, সে সম্পদের জন্য এখন শিশুর মত কাঁদছ'![৯]

প্রায় আট শতাব্দীর দীপ্তিমান শাসনের অবসানে আজ স্পেনের বুকে আঁকা আছে শুধু মুসলিম পরাজয়ের বেদনাবিধুর ছায়া, পরাধীনতার অপমানজনক ক্ষত। হারিয়ে গেছে আল-হামরার গৌরবোজ্জ্বল জ্যোতি, নিভে গেছে কর্ডোভা ও গ্রানাডার দীপ্তি। যেসব পথ একসময় মুসলিম জ্ঞান, সভ্যতা ও শৌর্যের পদধ্বনিতে মুখর ছিল সেসব আজ নিঃসৃত এক দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি মাত্র। যে আন্দালুস ছিল মুসলিম ঐতিহ্যের উজ্জ্বল প্রদীপ তা আজ ইউরোপীয় মানচিত্রে শুধু স্মৃতির এক করুণ প্রতিচ্ছবি।

৫. https://surl.li/clhfun.
৬. Tales of The Alhambra, p. 20.
৭. Jason Webster, Andalus : Unlocking The Secrets Of Moorish Spain (Great Britain : Black Swan, December 2004), p. 142.
৮. Washington Irving, The Alhambra (New York & London : G. P. Putnam's Sons, The Knickerbocker Press, n.d.), p. 99-100.
৯. মুসলিম স্পেন : রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি, পৃ. ২৭৪।

কারিকুলামে প্রতিভার মূল্যায়ন

*-সারওয়ার মিছবাহ**

আমরা যখন চাকুরীর আবেদনের জন্য একটি সিভি তৈরি করি তখন সেখানে আবেদনকারীর কোন্ কোন্ প্রতিভাগুলো বাদ দেয়া হয়? কারো কোন প্রতিভা আছে আর সেটা সে সিভিতে উল্লেখ করবে না, এমন হয় কখনো? হয় না। দেখুন! চাকুরীর বাজারে যে প্রতিভাগুলোর দাম আছে, বাস্তব জীবনে প্রয়োজন আছে, কারিকুলামের উচিৎ সেগুলোকে মূল্যায়ন করা। এটাই আমরা চাই। আমাদের সিভিতে যে ছোট্ট ছকে পরীক্ষার নাম, পাসের সন আর ফলাফল লেখা থাকে সেটা কমবেশী সবারই একই রকম। এজন্য ভাইভা বোর্ডের সদস্যরা একে অপরকে বলেন, 'ওটা রাখ! আর কি কি যোগ্যতা আছে সেটা দেখ'।

'ওটা রাখ' বলার সাথে সাথেই কিন্তু আপনার ১৫ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অবমূল্যায়িত হ'ল। এভাবে অবমূল্যায়িত হওয়ার কারণ, আপনার কারিকুলাম শুধু পাঠ্যপুস্তকের মাঝে সীমাবদ্ধ। ভাইভা বোর্ডের সদস্যরা আপনার সিভিতে 'আর যে যোগ্যতাগুলো' খুঁজছেন সেগুলো যদি আপনার কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত হ'ত তবে তিনি 'ওটা রাখ' বলতে পারতেন না। আর আমরা এমনই একটি কারিকুলামের স্বপ্ন দেখি, যে কারিকুলামের নাম্বার শীটই হবে একেকটি সিভি। সেটা কবে বাস্তবায়িত হবে আমরা জানি না। তবে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করি, যেন তিনি আমাদের অচিরেই এমন একটি শিক্ষাক্রম দেখার তাওফীক দান করেন- আমীন।

প্রস্তাবিত কারিকুলামে আমরা ঐ সকল মেধাকে কাজে লাগাতে চাই যারা শুধুমাত্র কিতাব কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে। একটু সহজ করে বোঝালে বুঝতে পারবেন। আমরা আমাদের ক্লাসে এমন অনেক মেধাবী ছাত্র পাই, যারা এই দুনিয়ার বুকে শুধু বইয়ের ঐ কালো কালো হরফগুলো ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। কোন খেলা সে খেলতে পারে না। কারো সাথে বসে দু'টো গল্প করতে পারে না। কোন কষ্টের কথায় সে কষ্ট পায় না। কোন কৌতুক তাকে হাসাতে পারে না। সে কখনো মোবাইলও ব্যবহার করে না। কারণ মোবাইল তাকে আকর্ষণই করে না। সে শুধু পড়া মুখস্থ করে এবং শিক্ষককে শোনায়। এতটুকুর মাঝেই তার জীবন সীমাবদ্ধ।

অনেকে বলবেন, আমরা তো এমনই ছাত্র চাই। দেখুন! এই ধরনের ছাত্র নিজের উপকার ছাড়া আর কারো উপকারে আসে না। তাদের মাধ্যমে পরবর্তীতে দেশ ও দশের তেমন একটা খিদমত হয় না। এই দোষ আমাদেরই। কেননা সে মেধাবী, সুতরাং আমরা চাইলে তার মেধাকে সার্বজনীন করতে পারতাম। তবে মেধাকে সার্বজনীন করার সেই সুবিধাগুলো আমাদের কারিকুলামে নেই। নেই বললে ভুল হবে। আমরা রাখিনি। আমরা আজকে সেই বিষয়গুলোই প্রস্তাবনায় রাখব। যে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হ'লে কারিকুলাম শুধু যোগ্য মানুষ তৈরি করবে না, বহুমাত্রিক যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ।

শুরুতেই আপনাকে প্রয়োজনীয়তা বুঝাই। মনে করুন, আপনার ক্লাসের একজন শিক্ষার্থী শুধু বই মুখস্থ করতে পারে। আর কিছুই পারে না। আরেকজন শিক্ষার্থী মুখস্থ খুব একটা ভাল পারে না। তবে সে খুব সুন্দর লিখতে পারে। ভাল আঁকতে পারে। সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে পারে। ভাল বক্তব্যও দেয়। উপস্থিত বুদ্ধি খুব ভাল। আপনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাবার পরে সে সকল ছাত্রদের গুছিয়ে রাখতে পারে। প্রতিষ্ঠানের যে কোন প্রোগ্রামে আপনাদের তাকে দরকার হয়। এবার বলুন, বার্ষিক পরীক্ষায় কার ফলাফল ভাল আসবে? প্রতিষ্ঠান কাকে ভাল শিক্ষার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দেবে? নিশ্চয়ই যে শুধু বই মুখস্থ করতে পারে তাকে। তাহ'লে আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিভার মূল্য কোথায়? আর প্রতিভার যদি কোন মূল্য না থাকে তবে প্রতিভাবান কিভাবে তৈরি হবে? মনে রাখবেন! বছরে দুইটা চিনামাটির থালা আর কিছু বই উপহার দিয়ে প্রতিভার মূল্যায়ন হয় না। প্রতিভার মূল্যায়নের জন্য প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে হয়।

শিক্ষার্থীদের মাঝে আমরা অনেক প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। সেখানে তারা বিভিন্ন প্রতিভা প্রদর্শন করে পুরস্কৃত হয়। একবার ভেবে দেখুন! আমরা তো কোন ধ্বংসাত্মক প্রতিভার কারণে শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করি না। যে প্রতিভাগুলো প্রশংসনীয় ও জীবন ঘনিষ্ঠ সেগুলোর কারণেই তারা পুরস্কৃত হয়। এখন এই প্রতিভাগুলো কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত হ'লে সমস্যা কি! যে বিষয়গুলো তারা বছরে একবার চর্চা করত সেটা প্রতি সপ্তাহে একবার চর্চা হবে। বার্ষিক পরীক্ষায় এই বিষয়গুলোও সীমিত কিছু নম্বরে মূল্যায়িত হবে। এই বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা কম। তবুও আমাদের মনে হয়, প্রতিভা যতদিন কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত না হবে ততদিন ভিন্ন কিছু দিয়ে প্রতিভার মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

আমি বাংলা ভাষা চর্চা করি মাধ্যমিক থেকে। মাধ্যমিকে আমি যে প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছি সেখানে বাংলা চর্চায় অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমরা কয়েক বন্ধু লুকিয়ে লুকিয়ে সাহিত্য চর্চা করতাম। বিভিন্ন অজুহাতে ছুটি নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যেতাম। ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতাম। তারপরও এই বিষয়গুলো শিক্ষকদের অজানা ছিল না। সাহিত্যচর্চাকে কেন্দ্র করে তারা বিভিন্ন মজলিসে আমাদেরকে অপমানজনক কথা শুনাতেন। তাদের বক্তব্য এমন ছিল, 'এখন শুধু পড়াশোনার সময়। এগুলো অনর্থক কাজ করার অনেক সময় আছে'। তারপরও তাদের কথাকে উপেক্ষা করেই আমরা নিজেদের কাজ করে যেতাম। এখন মনে হয়, আল্লাহ ভাল চান বলেই পড়াশোনার পাশাপাশি এই 'অনর্থক কাজগুলো' চর্চা করেছিলাম। অন্যথা এই 'অনর্থক কাজগুলো' শেখার সময় আর হ'ত না। আমরা যে প্রতিকূল পরিবেশে শিখেছি সেই

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

বৈরি আবহওয়ায় আমাদের কচি-কাচা প্রতিভাগুলো মারা যাক এটা আমরা চাই না। আমরা তাদেরকে সুযোগ দিতে চাই। যে অঙ্গন না পাওয়ার জন্য আমাদের মন কেঁদেছে আমরা আজ তাদেরকে সেই প্রশস্ত অঙ্গন উপহার দিতে চাই।

আমরা আজকের আলোচনায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে আরো কোন্ কোন্ প্রতিভাগুলোকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে তার একটি প্রস্তাবনা পেশ করব। পাশাপাশি মূল্যায়ন পদ্ধতিও সংক্ষেপে আলোচনা করব। এখানে বাড়তি যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে এগুলো সপ্তাহে ছয়দিন পাঠদানের মত কোন বিষয় নয়। তবে পরিপূর্ণ কারিকুলামে এগুলো প্রয়োজনীয়। এই পন্থায় একটু সময় নিয়ে যদি প্রতিভাগুলো পরিচর্যা করা যায় তবে আমাদের প্রতিভাগুলো আরো সুন্দরভাবে বিকশিত হবে ইনশাআল্লাহ। শুরুতেই আমরা কিছু বিশেষ বিষয়ে আলোচনা করব, যেগুলো সকল ক্লাসের জন্য যরূরী এবং সকল ক্লাসেই এই বিষয়গুলো মূল্যায়িত হবে।

আদর্শিক ভিত্তি : আমি যদি বলি, বর্তমানে অধিকাংশ কারিকুলামে আদর্শিক কোন ভিত্তি নেই তবে তা হয়তো ভুল হবে না। আমরা তো কারিকুলামকে শুধু ক্লাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। কিন্তু আদর্শ তো ক্লাসে পড়ানো হয় না। দুধের সাথে চিনি মিশিয়ে যেমন ছোট বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়, তেমনই পাঠদানের সাথে শিক্ষার্থীদের আদর্শ খাওয়ানো হয়। তাদের মস্তিষ্কে এমনভাবে আদর্শের বীজ বপন করে দেয়া হয়, যেন একজন শিক্ষার্থী যখন চোখ বন্ধ করে তখন তার আদর্শিক প্রতিচ্ছবিগুলোই দেখতে পায়। দশ/বার বছরের একটি লম্বা সময় যদি তারা এই অভিন্ন আদর্শিক চেতনা লালন করে তবে পরবর্তীতে তারা যেখানেই যাক, যে পরিবেশেই থাকুক তাদের মস্তিষ্কে অন্য কেউ জায়গা দখল করতে পারে না।

অনেকে বলবে, 'কারিকুলামে আদর্শিক ভিত্তি সংকীর্ণতার পরিচয়। এতে করে ছাত্রদের বিকশিত হ'তে বাধা দেয়া হয়'। তবে আমরা বলব, অনুসরণ করা মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ মাত্রই কাউকে অনুসরণ করে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের সামনে আদর্শিক ভিত্তি না থাকলে তাদের চিন্তাধারা ছোটাছুটি করে। সে নিজে নিজে অনুসরণের রূপরেখা তৈরি করে নেয়। ফলে যা হবার তাই হয়। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবো। অবশ্য আলিয়া শিক্ষাব্যবস্থাতেও এটা বিদ্যমান। দেখা যায়, সারা বছর একই বই পড়ে একজন স্বপ্নে মদীনা দেখে, আরেকজন স্বপ্নে দেখে ইউরোপের কোন উলঙ্গ শহর। কেউ নিজেকে ইবনে তায়মিয়া মনে করে, কেউ আবার নিজেকে রবীন্দ্রনাথ মনে করে। আবার কেউ নিজেকে নিউটন ভাবে।

আপনিই বলুন! আদর্শের জায়গা এত বিক্ষিপ্ত হবে কেন? এখন আপনি বলতে পারেন, 'আপনারাই তো বলেন যে, আমাদের আলেম দরকার আছে। আবার ডাক্তারও দরকার আছে'। হ্যাঁ, সত্যিই দরকার আছে। তবে আদর্শিক জায়গায় আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কঠিন সংকীর্ণতা রয়েছে। আমাদের একমাত্র আদর্শ মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার পরে আমাদের বাকী আলাপ হয়। তাঁকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা যদি বিজ্ঞানী হ'তে পারে তবে হোক। যদি না পারে তবে না হোক। বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষার্থীরা নিউটনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে এটা মেনে নেয়া যায় না। আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের চোখের সামনে বখাটের মত চুল রাখবে আর বেশ-ভূষায় পশ্চিমাদের অনুসরণ করবে এটাও মানা যায় না।

এবার আসি আদর্শের প্রয়োগ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে। আদর্শ অনেকগুলো বিষয়ের সমষ্টি। এর মাঝে ইবাদতে পাবন্দী, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, চুল-দাড়ি ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। আদর্শের আলোচনা থাকবে শিক্ষকদের নছীহতে। আদর্শ অনুসরণের সুবিধার্থে মাদ্রাসা থেকে একটি লিখিত নীতিমালা থাকবে। শিক্ষকরা সারা বছর সে বিষয়গুলো নোট করবেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বরে আদর্শের মূল্যায়ন করা হবে। যদি বলেন, ১০০ নম্বর অনেক বেশী হয়ে যায়, তবে আমরা বলব, আদর্শে ১০০ নম্বর কমই হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে আদর্শে আরো বেশী নম্বর রাখা প্রয়োজন।

সম্প্রতি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কওমী শিক্ষাবোর্ডের দাওরায়ে হাদীছ পরীক্ষায় ক্বিরাআত নামে ১০০ নম্বরের একটি মৌখিক পরীক্ষা রয়েছে। সেখানে শুধু কুরআন তিলাওয়াত শোনা হয় এবং বেশ-ভূষা, মুখের দাড়ি ইত্যাদি দেখা হয়। আর কিছু নয়। যদি কেউ ক্বিরাআত পরীক্ষায় পাশ নম্বর না পায় তবে তাকে পরের বছর আবার বোর্ড পরীক্ষা দিতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে যতই ভাল নম্বর পাক সে অকৃতকার্য বলেই গণ্য হবে। দেখুন! যে কুরআন তিলাওয়াত একজন ছাত্র মক্তবে শিখেছে সে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে দাওরায়ে হাদীছে! বোর্ডের উদ্দেশ্য যে, অশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী বা বেশ-ভূষায় তাদের আদর্শের বহির্ভূত কোন শিক্ষার্থীকে তারা দাওরার সনদপত্র দেবে না। তাদের এই উদ্যোগ সাধুবাদ পাবার যোগ্য। প্রত্যেকটি শিক্ষাধারায় আদর্শের জায়গাটা মযবূত থাকা যরূরী।

সৃজনশীলতা : এরপরেই সকল স্তরের ছাত্রের জন্য যে বিষয়টিকে কারিকুলাম মূল্যায়ন করবে সেটা সৃজনশীলতা। আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে দিনে দিনে সৃজনশীলতা বিদায় নিচ্ছে। তারা বইয়ের বাইরে কিছু শেখেও না, শেখার প্রয়োজনও মনে করে না। তাদেরকে এই ধারা থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য সৃজনশীলতাকে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। আমি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত করার জন্য শুধু প্রস্তাবনাগুলো বলছি। এটাই চূড়ান্ত রূপ নয়। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা হ'তে পারে পাঠ্যবইয়ের কবিতাগুলো অভিনয় করে আবৃত্তি করা, সুন্দরভাবে জাগরণী পরিবেশন করা, সুমধুর কণ্ঠে আযান দেয়া, সুন্দরভাবে ছবি আঁকা ইত্যাদি। মাধ্যমিকের সৃজনশীলতা হ'তে পারে আরবী

ভাষায় কথা বলতে পারা, ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারা, উর্দূ ভাষায় কথা বলতে পারা, যে কোন বিষয়ে উপস্থিত বক্তব্য দিতে পারা ইত্যাদি। উচ্চমাধ্যমিকে সৃজনশীলতা হ'তে পারে যেকোন বিষয়ে উপস্থিত বক্তব্য দিতে পারা, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করা ইত্যাদি।

প্রত্যেক স্তরের সৃজনশীলতায় কমপক্ষে ৩টি বিষয় থাকবে। যা মোট ৬০ নম্বরে মূল্যায়ন করা হবে। প্রত্যেক ক্লাসের নির্দিষ্ট দায়িত্বশীল শিক্ষক সৃজনশীলতার মূল্যায়ন করবেন। তিনিই সারা বছরে তাদেরকে বিভিন্নভাবে যাচাই করে একটি নোট তৈরি করবেন। প্রাথমিকে কোনদিন ক্লাসে জাগরণী গাইতে বলবেন। যারা গাইতে পারে তাদের বিষয়টি নোট নিবেন। কোনদিন বলবেন, ইচ্ছামত একটি ছবি আঁক। যারা আঁকতে পারে তাদের বিষয়টি নোট নিবেন। মাধ্যমিকে হঠাৎ একদিন উপস্থিত কোন ইস্যু নিয়ে উপস্থিত বক্তব্য আহ্বান করবেন। তবে উচ্চমাধ্যমিকে সৃজনশীলতা শিক্ষার্থীদের এ্যাক্টিভিটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ইনশাআল্লাহ।

সুন্দর হস্তাক্ষর ও আরবীতে উত্তরপত্র লেখা : আমাদের শিক্ষার্থীদের হাতের লেখার মান যে খুবই খারাপ তা না বললেও আপনারা জানেন। হাতের লেখার মূল্যায়ন কোন কোন শিক্ষাধারায় রয়েছে। তবে মূল্যায়নের বিষয়টি সার্বজনীন না করলে শিক্ষার্থীরা হাতের লেখা সুন্দর করার প্রয়োজনীতা অনুভব করছে না। ফলাফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রের হাতের লেখা একই রকম হয়ে গেছে। আমরা লেখা দেখে আর অনুমান করতে পারছি না যে, লেখক কোন ক্লাসে পড়ে। এ অবস্থায় বাড়তি নম্বর দিয়ে হাতের লেখাকে মূল্যায়ন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এছাড়াও একজন ছাত্রের সুন্দর ঝরঝরে লেখা আরেকজনের অস্পষ্ট ও এবড়ো থেবড়ো লেখার ওপরে প্রাধান্য পাবে না, এটা নীতিগতভাবেও মানা যায় না।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে ৯৫ নম্বরের প্রশ্ন হবে। বাকী ৫ নম্বর বরাদ্দ থাকবে সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য। যাদের হাতের লেখা স্পষ্ট শুধু তারাই ৯৫ এর ওপরে মার্কস পাওয়ার আশা করতে পারে। উচ্চমাধ্যমিক থেকে ওপরের দিকেও প্রশ্নপত্র ৯৫ নম্বরেরই হবে। তবে তাদের অতিরিক্ত ৫ নম্বর অরবীতে উত্তরপত্র লেখার ওপরে থাকবে। যখন ছাত্ররা দেখবে, আরবীতে না লিখলে মুমতায (৯০% মার্কস) ধরে রাখা একরকমের অসম্ভব হচ্ছে, তখন তারা নিজ উদ্যোগেই আরবী লিখতে শুরু করবে। এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিকের একজন শিক্ষার্থী আরবীতে সম্পূর্ণ উত্তর লিখেছে আরেকজন লিখেছে বাংলায়। এই দুজনের উত্তরপত্র যদি একই মাপকাঠিতে মূল্যায়িত হয়, আরবী যদি প্রাধান্য না পায় তবে ছাত্ররা আরবী লিখবে কেন? সুতরাং আমাদের মনে হয় সুন্দর হস্তাক্ষর ও আরবীতে উত্তরপত্র লেখাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা যরূরী।

প্রাথমিকের মূল্যায়নযোগ্য প্রতিভা : প্রতিটি স্তরের জন্য আমরা দুইটি করে অতিরিক্ত প্রতিভা প্রস্তাব করব। যেগুলো মোট ৪০ নম্বরে মূল্যায়ন করা হবে। তাহ'লে প্রতিটি স্তরে আদর্শে ১০০ এবং সৃজনশীলতা ও অতিরিক্ত প্রতিভায় ১০০, মোট ২০০ নম্বর কারিকুলামে নতুন যোগ করতে হবে। প্রাথমিকের জন্য অতিরিক্ত প্রতিভা হিসাবে প্রথম যেটা প্রস্তাব করা হবে তা হ'ল, 'দলগত কাজে সহযোগিতার মানসিকতা'। কারণ তারা ছোট। ছোট থেকেই অপরকে সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। অন্যথা বড় হওয়ার পরে এই মানসিকতা তৈরি হওয়া কঠিন।

এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ অপরকে সাহায্য করার পদ্ধতি উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝাবেন এবং এটা যে উত্তম এবং ছওয়াবের কাজ তা এদের মস্তিষ্কে গেঁথে দিবেন। সালাফে ছালেহীনের জীবন থেকে অপরকে সাহায্য করার ঘটনাগুলো তাদেরকে শোনাবেন। এরপর কোন একদিন ক্লাসের সকল ছাত্রকে একটি সম্মিলিত কাজের দায়িত্ব দিবেন এবং সেখানে কে কোন ভূমিকায় রয়েছে সেটা নোট করবেন। এভাবে বছরে কয়েকদিন তাদের পরীক্ষা করার মাধ্যমে অপরকে সহযোগিতার মানসিকতাকে মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রথমিকে এরপরে যে বিষয়টি আমরা প্রস্তাব করতে চাই তা হ'ল, দায়িত্ববোধ। একজন শিক্ষার্থীর মাঝে দায়িত্ববোধও এই বয়স থেকেই তৈরি হ'তে হবে। দায়িত্ব কাকে বলে তাকে বুঝতে হবে। তাদেরকে ক্লাসভেদে দায়িত্ব দিতে হবে। যেমন, কাউকে বলা হ'ল, আমি ক্লাসে আসার পূর্বে তুমি প্রতিদিন আমার চেয়ারটা মুছে রাখবে। কাউকে বোর্ড মুছে রাখার দায়িত্ব দেয়া হ'ল। কাউকে জানালা খুলে রাখার দায়িত্ব দেয়া হ'ল। এই ছোট্ট ছোট্ট দায়িত্বগুলো তারা কতটা নিখুঁতভাবে পালন করতে পারছে সেটা নোট করে সেই অনুযায়ী দায়িত্ববোধ মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রতিমাসে এই কাজগুলোতে নতুন দায়িত্বশীল এনে তাদেরকেও যাচাই করা যাবে। এগুলোর মাধ্যমে একজন ছাত্র আদর্শিক শিক্ষা, সৃজনশীলতা, সুন্দর হস্তাক্ষর, দায়িত্ববোধ ও অপরকে সাহায্য করার মানসিকতা নিয়ে প্রাথমিক পাড়ি দেবে ইনশাআল্লাহ।

মাধ্যমিকের মূল্যায়নযোগ্য প্রতিভা : মাধ্যমিকের জন্য আমরা প্রথমেই 'উপস্থাপন দক্ষতা'র বিষয়টি প্রস্তাব করব। উপস্থাপন দক্ষতার মৌলিক বিষয় হ'ল ভাষা জ্ঞান। অর্থাৎ বক্তব্যের ভাষা, প্রবন্ধ-নিবন্ধের ভাষা, বিতর্কের ভাষা, সমালোচনার ভাষা ইত্যাদির ওপরে সম্যক ধারণা থাকা। ক্ষেত্রভেদে এই ভাষাগুলো পরিবর্তন হয়ে থাকে। অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হয় যে, আমাদের মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে বক্তব্য চর্চার আধিক্য ধরে রেখেছে কওমী প্রতিষ্ঠান। কওমী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কিতাব বিভাগে দুই তিন বছরের অধ্যয়নে স্টেজে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে। তবে তাদের ভাষাচর্চা সর্বদা আমাদের নিরাশ করেছে। বড় বড় নামী দামী বক্তাদের মুখেও আমরা এমন সব সমালোচনার ভাষা শুনি যা আমাদের ব্যথিত করে। সাধারণ বক্তব্যেও নিরেট শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা বক্তা খুবই কম।

ক্ষেত্রভেদে ভাষাচর্চা নতুন বিষয় নয়। হাযার বছর আগে আমাদের ইমামগণ প্রবন্ধ লিখেছেন। ফৎওয়া লিখেছেন। একে অপরের সমালোচনাও করেছেন। এক ইমাম আরেক ইমামের সাথে দ্বিমত করে ফৎওয়া লিখেছেন। আমাদের সকল ঘরানার ওলামায়ে কেরাম অন্যান্য উপস্থাপনায় বেশ সিদ্ধহস্ত হ'লেও সমালোচনার বেলায় তারা ভাষার খেই হারিয়ে ফেলেন। একে অপরকে গালি দেয়া শুরু করেন। আমরা চাই না, আমাদের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে গালি-গালাজে অভ্যস্ত হোক। তারা এমনি কথা বলুক, প্রবন্ধ লিখুক, বক্তব্য দিক বা কোন অন্যায়ের সমালোচনা করুক, তাদের ভাষা যেন সর্বদা শালীন ও মার্জিত হয়। এ বিষয়গুলোতে ছাত্রদের অভ্যস্ত করতে হবে এবং তাদের লেখাপত্র-কথাবার্তা থেকেই এই বিষয়টি মূল্যায়ন করতে হবে।

এরপরে মাধ্যমিকের দ্বিতীয় বিষয় হিসাবে 'নেতৃত্বের যোগ্যতা' থাকতে পারে। প্রতিষ্ঠান যদি সাংগঠনিক হয় তবে নেতৃত্বের চর্চা ও মূল্যায়ন সহজ হয়। কারণ আমাদের নেতৃত্ব এটা নয় যে, ছাত্রদেরকে নিয়ে রাজপথে নামতে হবে। আমাদের কাছে নেতৃত্বের যোগ্যতা বলতে একজন আদর্শ নেতার যে সকল গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, সে সকল গুণাবলী ছাত্রের মাঝে থাকতে হবে। যোগ্য নেতার গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য না করে কেবল ছাত্রদেরকে নিয়ে দলাদলি করা নেতৃত্বের যোগ্যতা হিসাবে গণ্য হবে না। পাশাপাশি শিক্ষার্থী যখন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবে তখনই তাকে নেতৃত্বের যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে। কারণ আমরা রাজপথ কাঁপানো শ্লোগানের ধ্বনির মাঝে যোগ্য নেতা খুঁজি না। আমরা আখেরাতমুখী মানুষ তৈরি করতে চাই। এজন্য আমাদের সকল নীতিতে কিছুটা ভিন্নতা থাকবেই। এই ধারায় একজন ছাত্র আদর্শিক শিক্ষা, সৃজনশীলতা, সুন্দর হস্তাক্ষর, উপস্থাপন দক্ষতা এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা নিয়ে মাধ্যমিক পাড়ি দেবে ইনশাআল্লাহ।

উচ্চমাধ্যমিকের মূল্যায়নযোগ্য প্রতিভা : এই স্তরে শিক্ষার্থীরা অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়। একাডেমিক বা পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে তাদেরকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এজন্য এই স্তরে আমরা প্রথম বিষয় হিসাবে 'সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধান প্রস্তাবনা'র যোগ্যতাকে রাখতে চাই। আপনারা মনে করতে পারেন, এটা কোন বিষয় হ'ল! এটা তো সবাই পারে। না, এটা সবাই পারে না। প্রত্যেকটি স্থানেই সমস্যা বিদ্যমান। তবে আমাদেরকে যখনই সমস্যা বিশ্লেষণ করতে বলা হয় তখন শতকরা ৯৯ জনই অভিযোগের পসরা সাজিয়ে বসি। দেখুন! সমস্যা উপস্থাপন ও অভিযোগের ভেতরে পার্থক্য রয়েছে। ছাত্রদেরকে যদি বড় ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে তিন দিনের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত লেখা শিখানো যায় তবে সমস্যা সংবলিত একটি পরিস্থিতি থেকে সমস্যা বিশ্লেষণ লেখাও শিখানো যায়।

এবার আসি সমাধান প্রস্তাবনার বিষয়ে। আমরা দীর্ঘ কারিকুলামে শুধু গণিতের সমস্যা সমাধান আর তারকীবের সমস্যা সমাধান করতেই শিখি। আর বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোতে অভিযোগ করতে শিখি। তবে আমাদের সেটাও সমাধানের কৌশল শেখার দরকার ছিল। শিক্ষার্থীরা সমাধানের কৌশল শিখবে শিক্ষকদের আলোচনা এবং ইতিহাস থেকে। আর তারা এটা চর্চা করবে নিজেদের জীবনে ও অঙ্গনে। শিক্ষকগণ এই বিষয়টি মূল্যায়ন করবেন তাদের বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ দেখে। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাদেরকে সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধান প্রস্তাবনার এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া যেতে পারে। এতেও তাদের যোগ্যতার স্তর পরিমাপ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

এই স্তরের দ্বিতীয় প্রতিভা হিসাবে আমরা 'কাউন্সেলিং' রাখতে পারি। কাউন্সেলিং একটি নববী গুণ। আমাদের নবী (ছাঃ)-এর জীবনীর দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে মানুষ তাঁর কাছে আসত। তিনি কখনো তাদের সান্ত্বনা দিতেন। কখনো পরামর্শ দিতেন। এটাই কাউন্সেলিং। আধুনিক যুগে এটি একটি পেশাতে রূপ নিয়েছে। এর মৌলিক কাজ হ'ল, বয়সতান্ত্রিক সমস্যা, মানসিক ও পারিবারিক চাপ ইত্যাদিতে দ্বীনী দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এটা অনেকটা মাসনিক চিকিৎসার মত। যা সবাই পারে না। এজন্য দেখা যায়, পরামর্শদাতা হিসাবে সবাই পারফেক্ট হয় না। এ বিষয়ের মূল্যায়ন হ'তে পারে এ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে। আবার প্রাথমিক বা মাধ্যমিকের কোন আত্মনিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রের কাউন্সেলিং এর দায়িত্ব দিয়েও দেখা যেতে পারে।

শেষকথা : আলোচ্য প্রবন্ধে যে বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়েছে তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এটাই চূড়ান্ত রূপ নয় বা আলোচনা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে আরো অনেক পথ। সকলে মিলে এটাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে হবে। বিষয়গুলোতে কমবেশী বা নম্বরে কমবেশী হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি নিতে হবে। তারা কোন প্রতিভাগুলো কিভাবে বিকশিত করার চেষ্টা করবেন। কিভাবে মূল্যায়ন করবেন। এই বিষয়গুলোর একটি রূপরেখা দরকার হবে। সব মিলিয়ে অনেক সময়ের দরকার। তবে দুঃখের বিষয় হ'ল, এতটা সময় আমাদের নেই।

আমরা সবকিছু খুব শর্টকার্টে শেষ করতে চাই। কিন্তু পদ্ধতিগত ভুলের কারণে আমাদের ফলাফল সেই শূন্যের কোটায়। ঔষধ খাওয়ার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য নছীহত করতে করতে আমরা ক্লান্ত। তারপরও তারা চকলেট খেতেই আগ্রহী। আমরা চাই যোগ্যতা। তারা চায় শুধুমাত্র মার্কস। এখন চকলেটের ভেতরে ঔষধ ঢুকিয়ে খাওয়ানো ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে সেটাই করার চেষ্টা করেছি। প্রতিভা ও পরীক্ষার একটি মেলবন্ধন তৈরির চেষ্টা করেছি। আমাদের মনে হয়েছে, এটা সম্ভব। আমাদের মনে হয়েছে, এই প্রতিভাগুলোর মূল্যায়নে নম্বর যত বাড়ানো হবে তত বহুমাত্রিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী তৈরি হবে।

আমাদের মনে হয়, এই প্রস্তাবনাগুলো ঘষামাজা করলে একটি মানসম্মত কারিকুলাম পাওয়া সম্ভব। তবে আমরা

জানি, এটা বাস্তবায়িত হবে না। কারণ স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে উল্টো দিকে। আজ ছাত্র ও অভিভাবকের কাছে আমরা শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ। বেশী নয়, মাত্র পাঁচজন অভিভাবক যদি একত্রিত হয়ে বলে, এসব নতুন নিয়ম চলবে না। তাহ'লেই আমাদের টনক নড়ে যাবে। আমরা সাথে সাথেই তা বাতিল করব। কারণ শিক্ষাব্যবস্থায় হার্ডলাইনে যাওয়ার অধিকার কেবল ছাত্র ও অভিভাবকের রয়েছে। তারা যদি একবার বলে এই নিয়ম মানি না। তাহ'লে সাথে সাথেই আমরা নিয়ম পরিবর্তন করি। তারা যদি বলে, অমুক শিক্ষক চাই না। সাথে সাথেই আমরা শিক্ষক পরিবর্তন করি। আসলে আমাদের শুধু অস্তিত্বটুকুই আছে। কোন স্বকীয়তা নেই।

তবুও আমরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। পাতার পরে পাতা লিখে যাই। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধারায় একদিন পরিবর্তন আসবে। সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। আজ হয়ত আমরা আগুন জ্বালানোর জন্য মশাল খুঁজে পাচ্ছি না। তবে হঠাৎই কোন একদিন হাযার হাযার মশাল চলে আসবে। সেদিন যেন মশাল জ্বালতে একটি দিয়াশলাইয়ের অভাব না হয়। এজন্যই আমরা নিজেদের চিন্তাধারা জমিয়ে রাখছি। আমি আমার এক মুশফিক ওস্তাদকে শিক্ষাধারার বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করতাম। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার কাছে অভিযোগ কর। আমার কি এগুলো সংস্কার করার মত সাধ্য আছে? বরং তুমি তোমার প্রতিদিনের অভিযোগগুলো চিরকুটে লিখে একটি বক্সে রেখে দাও। যদি কোনদিন আল্লাহ তোমাকে সামর্থ্য দান করেন সেদিন বক্স থেকে সব অভিযোগগুলো বের করে সমাধান করো'।

তার কথাটা আমার খুব মনে ধরেছিল। তারপর থেকে আমি আর কারো কাছে অভিযোগ করি না। আবার অভিযোগগুলো ভুলেও যাই না। পুষে রাখি। জিইয়ে রাখি। ছোট্ট চারাগাছকে যেভাবে যত্নে রাখা হয় তেমনই যত্নে রাখি আমার এলোমেলো অযৌক্তিক অভিযোগ ও প্রস্তাবনাগুলো। কখনো মনে হয় এগুলো এভাবেই পড়ে থাকবে। কখনো মনে হয়, এগুলো হবে হাযার মশাল জ্বালানো দিয়াশলাই। তবে আমি এই কথাগুলো জমিয়েই রাখব। হয়ত এগুলো কোনদিন পরিবর্তনের সোপান হবে। নয়ত হবে অনর্থক বক্সে সঞ্চয় করা নিছক চিরকুট।

ডাঃ মোঃ শওকত হাসান
এমবিবিএস (এসএসএমসি)
পিজিটি (ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন)
ডি-কার্ড (কোর্স-কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার
এন্ড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
১৭০, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়ক, পুলিশ কোয়ার্টার, (ফেনী চক্ষু হাসপাতালের পার্শ্বে), ফেনী।
ফোন: ০৩৩১-৬২১১৭, মোবাইল: ০১৯০৫-১১১৬৬৬
০১৯০৫-২২২৭৭৭, ০১৯০৫-৭৭৭১১১
রোগী দেখার সময়
প্রতিদিন সকাল ৯-টা দুপুর ২-টা, বিকাল ৪-টা রাত ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪
Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পণ্য সমূহ
- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই
যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

শিশুদের জন্য স্ক্রিন টাইম ও কন্টেন্ট নির্বাচন

*-জাহিদ হাসান**

গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিশুদের জন্য 'দেখানো উচিত নয়' বা 'দেখানো উচিত' এমন কিছু চ্যানেলের তালিকা নিয়ে বিভিন্ন পোস্ট চোখে পড়ছে। বর্তমান সময়ে এই ধরনের আলোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তবে একজন সচেতন মুসলিম অভিভাবক হিসাবে আমাদের আরও গভীর এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। শুধুমাত্র কারো পোস্টে চ্যানেলের তালিকা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যথেষ্ট নয়, বরং শিশুদের ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে রাখার বিষয়ে আমাদের সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

আজকের ডিজিটাল যুগে শিশুদের বিনোদন, শিক্ষা বা সৃজনশীলতা বিকাশে স্ক্রিনের ভূমিকা অনেকটাই বেড়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইউটিউব, ফেসবুক বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় অসংখ্য কন্টেন্ট রয়েছে, যার মধ্যে কিছু অংশ শিক্ষণীয় হ'লেও অধিকাংশই শিশুদের মানসিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিকাশের জন্য ক্ষতিকর। অনেক অভিভাবক মনে করেন, এগুলো চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের সন্তানরা অনেক কিছু শিখবে এবং সৃজনশীল হয়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন। বাস্তবতা হ'ল, স্ক্রিন টাইমের অদৃশ্য ঝুঁকি অনেক অনেক বেশী। আজকে স্ক্রিন টাইম ও বিভিন্ন চ্যানেলের প্রভাব সম্পর্কে পাঁচটি প্রধান কারণ এবং একজন মুসলিম অভিভাবকের করণীয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

ভিডিও কন্টেন্ট থেকে অতিরঞ্জিত প্রত্যাশা : এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, যেকোন চ্যানেলের ভিডিও দেখেই শিশুরা রাতারাতি অনেক কিছু শিখে ফেলবে বা অসাধারণ সৃজনশীল হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, শিশুরা হয়তো কিছু নতুন শব্দ শিখতে পারে বা কোন ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু এই অল্প শেখার থেকে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশী। শিশুদের মস্তিষ্ক দ্রুত বিকশিত হয় এবং তারা যা দেখে, শোনে ও অনুভব করে, তার দ্বারাই তাদের মনন গঠিত হয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্য, অতিরিক্ত রঙ এবং উদ্দীপক শব্দ শিশুদের মস্তিষ্কে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যা তাদের মনোযোগের সময়কাল (attention span) কমিয়ে দিতে পারে এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে তাদের সংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। প্রকৃত সৃজনশীলতা এবং শেখার জন্য শিশুদের ইন্টারেক্টিভ খেলাধুলা, গল্প বলা, পড়া এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, যা স্ক্রিন টাইম সাধারণত পূরণ করতে পারে না।

অভিভাবকহীন স্ক্রিন টাইম : অনিরাপদ ক্ষতিকর! শিশুদের যদি কোন চ্যানেল দেখতে দিতেই হয়, তবে অভিভাবকের সাথে থাকার চেষ্টা করা আবশ্যক। অভিভাবকহীন স্ক্রিন টাইম শিশুদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হ'তে পারে। শিশু কী দেখছে, কী শিখছে তা পর্যবেক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব। যখন শিশুরা একা স্ক্রিনের সামনে থাকে, তখন তারা এমন কন্টেন্টের সংস্পর্শে আসতে পারে যা তাদের বয়সের জন্য অনুপযুক্ত, সহিংস বা বিভ্রান্তিকর। এমনকি বর্তমানে 'শিশুদের জন্য' তৈরি বলে দাবী করা অনেক কন্টেন্টেও অপ্রত্যাশিত বা নেতিবাচক বার্তা থাকে। অভিভাবকের উপস্থিতি শিশুদের কন্টেন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে এবং প্রাপ্ত তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে সাহায্য করে। একজন অভিভাবক কন্টেন্টের মাধ্যমে আসা সম্ভাব্য ক্ষতিকারক বার্তাগুলোকে ফিল্টার করতে পারেন এবং শিশুর মনে সেগুলোর ভুল প্রভাব পড়া থেকে বিরত রাখতে পারেন। এটি একটি সুযোগ যখন অভিভাবক তার সন্তানকে ডিজিটাল সাক্ষরতা (digital literacy) শেখাতে পারেন।

ধরুন, আপনার সন্তান এমন একটি কার্টুন দেখছে যেখানে একটি চরিত্র মিথ্যা কথা বলছে কিন্তু তার জন্য কোন খারাপ ফলাফল দেখানো হচ্ছে না। যদি আপনি তার সাথে থাকেন, তাহ'লে আপনি সন্তানকে বোঝাতে পারবেন যে মিথ্যা বলা খারাপ এবং এর কি কি কুফল হ'তে পারে। কিন্তু অভিভাবকহীন অবস্থায় শিশু হয়তো এই কন্টেন্টের মাধ্যমে মিথ্যা বলার প্রবণতাকে স্বাভাবিক হিসাবে ধরে নিতে পারে।

বয়সভিত্তিক কন্টেন্ট নির্বাচন : কোন পোস্ট দেখেই অন্ধের মতো শিশুদের স্ক্রিনে বসিয়ে দেওয়া কখনোই ঠিক হবে না। প্রতিটি শিশুর বয়স, মানসিক বিকাশ এবং ধারণ ক্ষমতা ভিন্ন। তাই কোন বয়সের শিশুর জন্য কোন চ্যানেল বা কন্টেন্ট উপযুক্ত, তা নির্ধারণ করে দেওয়া অত্যন্ত যরূরী। যেমন, একটি ২ বছরের শিশুর জন্য যে কন্টেন্ট উপযুক্ত, একটি ১০ বছরের শিশুর জন্য তা হয়তো একেবারেই নয়। ছোট শিশুদের জন্য ধীর গতির, সহজ এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কন্টেন্ট প্রয়োজন হয়, যেখানে বড় শিশুরা আরও জটিল গল্প এবং তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান থেকে শিখতে পারে। বয়সভিত্তিক কন্টেন্ট নির্বাচন না করলে শিশুরা হয়তো এমন বিষয়বস্তু দেখবে যা তারা বুঝতে পারছে না, ফলে তারা বিরক্ত হ'তে পারে বা অযাচিত তথ্য গ্রহণ করতে পারে। এতে তাদের মস্তিষ্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এবং তাদের মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি হ'তে পারে।

অনাকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপন : অজান্তেই ভুল নির্দেশনা!

বর্তমানে অধিকাংশ ভিডিওতে না চাইতেও অনাকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপন এসে যায়। আমাদের দেশে যেহেতু অনেকেই অ্যাড ব্লকার কোন অ্যাপ ব্যবহার করেন না, সেহেতু এসব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও শিশুরা ভুল নির্দেশনা বা ভিডিও দেখে যেতে পারে। বিশেষ করে, ইউটিউব বা অন্যান্য স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে শিশুরা যখন ভিডিও দেখে, তখন তাদের সামনে এমন সব বিজ্ঞাপন ভেসে আসে যা তাদের বয়সের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। এসব বিজ্ঞাপনে সহিংসতা, অনুপযুক্ত পোশাক, জুয়ার বিজ্ঞাপন, ভোগ্যপণ্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তৈরি করা বা বিতর্কিত রাজনৈতিক/সামাজিক বার্তা থাকার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। শিশুরা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না এবং সেগুলোকে কন্টেন্টেরই অংশ হিসাবে ধরে নিতে পারে। এর ফলে তারা অজান্তেই এমন ধারণা বা পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে যা তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অ্যাড ব্লকার ব্যবহার না করলে এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

তাওহীদ পরিপন্থী কন্টেন্ট : মুসলিম অভিভাবকদের বিশেষ সতর্কতা! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, আমরা মুসলিম। তাওহীদ পরিপন্থী ১% কন্টেন্টও যদি শিশুদের সামনে আসে, তাহ'লেও তা থেকে বিরত রাখতে হবে। বর্তমান দুনিয়ার

** সহকারী শিক্ষক, শান্তি নিকেতন ইন্সটিটিউট, ফেনী।*

অধিকাংশ কন্টেন্ট ও চ্যানেল যারা পরিচালনা করে, তারা হালাল-হারাম বিবেচনা করে কন্টেন্ট বানায় না। মুসলিম হিসাবে আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে তাওহীদের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা আমাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। অনেক জনপ্রিয় শিশুতোষ চ্যানেল, এমনকি 'শিক্ষামূলক' বা 'বিজ্ঞান' বিষয়ক চ্যানেলগুলোও এমন কিছু উপাদান রাখে যা ইসলামী আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন, শিরক। কিছু কার্টুন বা কনটেন্টে এমন চরিত্রের উপাসনা দেখানো হয় যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত।

এরপরে রয়েছে যাদু বা কুসংস্কার। কিছু গল্পে যাদু বা এমন অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো হয় যা কখনো সম্ভব নয়। এরপরে লিঙ্গ পরিচয় ও সম্পর্ক। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রচলিত এমন লিঙ্গ পরিচয় বা সম্পর্ক দেখানো হ'তে পারে যা ইসলাম সমর্থন করে না। সর্বোপরী শালীনতা লঙ্ঘন। অ্যানিমেল, সায়েন্স, রাইম বা এডুকেশন বিষয়ক বেশীরভাগ ভিডিওতে যারা আলোচনা করেন, হয়তো শালীন পোশাক পরেন না বা গান-বাজনা থাকে, কিংবা এমন কিছু দেখানো হয় যা মুসলিম সন্তানদের জন্য ঠিক নয়। গানের ব্যবহার বা বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম।

এই ধরনের কন্টেন্ট শিশুদের অজান্তেই তাদের বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে এবং তাদের মনে ইসলামিক মূল্যবোধের প্রতি বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। একজন সচেতন মুসলিম অভিভাবক হিসাবে আমাদের সন্তানদের এই ধরনের কন্টেন্ট থেকে রক্ষা করা ফরয। যেমন ধরুন, একটি বিজ্ঞান বিষয়ক ভিডিওতে হয়তো বিবর্তনবাদকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হ'ল যা একজন মুসলিমের সৃষ্টির ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। অথবা একটি শিক্ষামূলক রাইমে এমন গান বা মিউজিক ব্যবহার করা হ'ল যা শিশুর মনে সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি তৈরি করল, যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম।

আমাদের করণীয় :

একজন সচেতন মুসলিম অভিভাবক হিসাবে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন, স্ক্রিন টাইম সীমিত করুন। সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হ'ল শিশুদের স্ক্রিন টাইম কঠোরভাবে সীমিত করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে, ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য কোন স্ক্রিন টাইম নয়। ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য দিনে ৩০ মিনিট কিংবা ১ ঘন্টার অধিক নয় এবং তাও একজন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। বড় শিশুদের ক্ষেত্রেও স্ক্রিন টাইম সীমিত রাখুন এবং তাদেরকে বাইরের খেলাধুলা, বই পড়া, পারিবারিক আলোচনা এবং সামাজিক কার্যকলাপে উৎসাহিত করুন। তবে আমি বলি, একটা বয়স পর্যন্ত, যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে একদমই না দেয়ার জন্য।

এরপরে কন্টেন্ট যাচাই-বাছাই করুন। যদি একান্ত স্ক্রিন টাইম দিতেই হয়, তাহ'লে একটু সচেতন হোন। কোন ভিডিও বা চ্যানেল দেখার আগে অভিভাবক নিজেই সেটি দেখে নিন। কন্টেন্টের বিষয়বস্তু, ব্যবহৃত ভাষা, ছবি এবং সামগ্রিক বার্তা আপনার ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না, তা যাচাই করুন। নিজস্ব প্লে লিস্ট তৈরি করুন। মাহফিল অ্যাপ, ইউটিউবে বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে শিশুদের জন্য 'সেফ প্লে লিস্ট' তৈরি করুন। শুধুমাত্র সেই ভিডিওগুলোই যুক্ত করুন যা সম্পূর্ণ হালাল ও উপকারী। কিছু ইসলামিক অ্যাপ বা ওয়েবসাইট আছে যা শিশুদের জন্য ইসলামী কন্টেন্ট সরবরাহ করে। সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন, যেমন- ইসলামিক কার্টুন চ্যানেল, ইসলামী গল্প, সূরা শেখানোর ভিডিও ইত্যাদি।

যখন আপনার শিশু স্ক্রিন দেখছে, তখন আপনি তার সাথে থাকুন। কন্টেন্ট সম্পর্কে তার সাথে কথা বলুন। কী দেখছে, কী বুঝছে, তা নিয়ে আলোচনা করুন। যদি কোন প্রশ্ন আসে বা কোন ভুল ধারণা তৈরি হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার সঠিক ব্যাখ্যা দিন। কন্টেন্টের মধ্যে যদি কোন তাওহীদ পরিপন্থী বিষয় আসে, তাহ'লে সেটিকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করুন বা দ্রুত পরিবর্তন করুন। পাশাপাশি আপনি নিজে আদর্শ বাবা-মা হোন। আপনি নিজে কতটা স্ক্রিন ব্যবহার করেন এবং কীভাবে ব্যবহার করেন, তা আপনার সন্তানের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে। আপনি যদি সারাক্ষণ ফোন বা টিভিতে মগ্ন থাকেন, তাহ'লে আপনার সন্তানও সেটিই শিখবে। নিজে কুরআন পড়া, বই পড়া এবং পারিবারিক কার্যকলাপে সময় দিয়ে সন্তানের জন্য আদর্শ স্থাপন করুন।

তাদেরকে ডিভাইসের বিকল্প বিনোদনে উৎসাহিত করুন। যেমন, ইসলামী বই ও গল্প। শিশুদের জন্য ইসলামী গল্প ও নীতিভিত্তিক বইয়ের ব্যবস্থা করুন। নিয়মিত তাদের সাথে গল্প পড়ুন এবং গল্পের নৈতিক শিক্ষাগুলো বুঝিয়ে দিন। তবে সেক্ষেত্রেও সতর্ক থাকবেন। লেখকের আক্বীদা ও মানহাজ সম্পর্কে ধারণা নিবেন এবং নিজে বই বা গল্প আগে পড়ে নিবেন কোন ভুল তথ্য আছে কি-না। এছাড়াও আউটডোর খেলাধুলাতে উৎসাহিত করুন। যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত যরূরী। সৃজনশীল কার্যকলাপে উৎসাহিত করুন। যেমন, প্রাণ নেই এমন বস্তুর ছবি আঁকা, কাদা/ক্লে দিয়ে খেলা, ব্লক তৈরি, ওয়ার্কশীট নিয়ে খেলা, বাগান করা, পোষা প্রাণী পালন ইত্যাদি সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন।

সন্তানের সাথে ডিজিটাল মিডিয়ার ভালো-মন্দ দিক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন। তাদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা কী দেখছে, কেন দেখছে এবং এতে তাদের কেমন লাগছে। তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিন। পাশাপাশি ইন্টারনেট ফিল্টার বা প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সফটওয়্যার ব্যবহার করুন। এগুলো আপনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত কন্টেন্ট ব্লক করতে সাহায্য করবে এবং স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে। যেমন, Kahf browser ব্যবহার করতে পারেন।

পরিশেষে বলব, আমাদের সন্তানরা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান আমানত। তাদের অন্তরে তাওহীদ এবং সুন্দর চরিত্রের বীজ বপন করতে আমাদের সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিম অভিভাবক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব শিশুর প্রতিটি পদক্ষেপ চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া। এটি দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়েরই কল্যাণ নিশ্চিত করে। আল্লাহ আমাদের সন্তানদের ইলম, তাকওয়া ও ঈমানের সঙ্গে বেড়ে উঠার তাওফীক দান করুন- আমীন!

সন্তানকে মুছল্লী বানাবেন কিভাবে?

*মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম**

গল্পটি একজন মায়ের জীবন থেকে নেওয়া একটি বাস্তব ঘটনা। তিনি বলেন, আমার মেয়ে একসময় ছালাতের ব্যাপারে খুবই অলস ছিল। একদিন আমি আমার মেয়েকে বললাম, 'ওঠো, ছালাত আদায় কর'। সে আমার কথামতো উঠে মুছল্লা (জায়নামায) নিয়ে ঘরের ভিতরে গেল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, সে মুছল্লাটি মেঝেতে ছুড়ে ফেলল এবং তার পাশে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর বের হয়ে আসলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তার মুখে এক থাপ্পড় মেরে দিলাম। আমি জানি, এটা আমার ভুল হয়েছিল। পরে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। এরপর আমি ছালাতের জন্য তার সাথে বহুবার রাগারাগি করেছি, বকা দিয়েছি, আল্লাহ্র ভয় দেখিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হয়নি। এটি নিয়ে দীর্ঘদিন আমি খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

একদিন আমার এক বান্ধবী আমাকে একটি ঘটনা বলল। সে তার একজন আত্মীয়ার বাসায় গিয়েছিল। তার সেই আত্মীয়া অতটা ধর্মপরায়ণ না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল, যখন আযান হ'ল, তার ছেলে-মেয়েরা নিজেরা উঠে গিয়ে ছালাত আদায় করতে লাগল। তাদের কাউকে ডাকারও প্রয়োজন হ'ল না।

তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ছেলেমেয়েরা কেমন করে ছালাতের প্রতি এমন আগ্রহী হ'ল? তুমি তো রাগারাগি করলে না, বকাবকি করলে না। এমনকি একটা ডাকও দিলে না!

তিনি বললেন, সত্যি বলতে আমি তেমন কিছুই করিনি। শুধু একটা কাজ করেছি। আমি বিয়ের আগে থেকেই একটা দো'আ করতাম, আজও করি। হয়তো সেই দো'আর কারণেই আল্লাহ আমাকে এই নে'মত দিয়েছেন।

তার এই গল্প শোনার পর থেকে আমিও নিয়মিত এই দো'আটি পড়তে লাগলাম। প্রতিটি সিজদায়, ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে ও পরে, তাহাজ্জুদের সময়সহ দো'আ কবুলের সময়-গুলোতে আমি দো'আটি পড়তাম। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সেই মেয়েটি (যে একসময় ছালাতে অলসতা করত) নিজেই এখন বাড়ির সবাইকে ছালাতের জন্য ডাকে! সে ভোরবেলা উঠে আমাদের ঘরে ঘরে গিয়ে 'ওঠো, ছালাতের সময় হয়ে গেছে' বলে ডেকে বেড়ায়। তার ভাই-অন্যান্য বোনেরাও সকলে ছালাতের ব্যাপারে খুব যত্নশীল। আলহামদুলিল্লাহ।

আপনারা নিশ্চয়ই জানতে আগ্রহী, সেই দো'আটি কী? দো'আটি কুরআনে আছে। তা হ'ল, رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (*রব্বীজ'আলনী মুক্বীমাছ ছলাতি ওয়া মিন যুররিয়াতী, রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আ*) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ছালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমার দো'আ কবুল কর' *(ইব্রাহীম ১৪/৪০)*।

সুতরাং দো'আই হ'ল মূল অস্ত্র। প্রিয় পাঠক! আমরা প্রায়শই দো'আ করতে ভুলে যাই। আমরা কেবল তখনই দো'আ করি, যখন আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া যখন আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের উচিত সর্বদা আল্লাহ্র তাওফীক কামনা করা। কোন কাজের পরিকল্পনাতেই আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইতে হবে। যেমন এই বোনটি বিয়ের আগেই সন্তানের জন্য দো'আ করতেন। কেননা আল্লাহ চাইলে সবকিছু বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। সকল অসম্ভাবনার বদ্ধ দুয়ার তিনি খুলে দিতে সক্ষম। তাই আপনার সন্তানদের মুছল্লী বানাতে চাইলে আজ থেকেই নিয়মিত দো'আ শুরু করুন।

জনৈক ব্যক্তি বলেছিলেন, ছোটবেলায় আমি স্বপ্ন দেখতাম, আমি পুরো উম্মাহকে বদলে ফেলব। তারপর যখন একটু বড় হ'লাম, ভেবেছিলাম, এটা অনেক কঠিন কাজ। তবে আমি অন্তত আমার দেশকে উন্নত করব। আরও বড় হয়ে চিন্তা করলাম, অন্তত আমার শহরকে পরিবর্তন করব। কিন্তু আমি এগুলোর কিছুই করতে পারিনি। বরং আমি লক্ষ্য করলাম, আমার নিজেরই উন্নয়ন প্রয়োজন। আমি উপলব্ধি করলাম, বড় কিছু বদলাতে চাইলে ছোট থেকেই শুরু করতে হয়। তাই আপনি যদি সমাজ সংস্কারের স্বপ্ন দেখেন, তাহ'লে আগে নিজ স্ত্রী-সন্তানদের যত্ন নিন, আদর্শ পরিবার গড়ে তুলুন। তাহ'লে আস্তে আস্তে পুরো সমাজ বদলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এজন্য কুরআনে বর্ণিত নিম্নোক্ত দো'আসমূহ হ'তে পারে আপনার অব্যর্থ হাতিয়ার। ১. যাকারিয়া (আঃ)-এর দো'আ, رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ'তে একটি পূত-চরিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে-ইমরান ৩/৩৮)*। ২. ইব্রাহীম (আঃ)-এর দো'আ, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ، 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে একটি সুসন্তান দান কর' *(ছা-ফ্ফা-ত ৩৭/১০০)*। ৩. স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দো'আ, رَبَّنَا هَبْ لَـنَا مِنْ اَزْوَاجنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا، 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষু শীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের নেতা বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

---

* *শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

কবিতা

খেলাফতের ডাক

-মাহফূয আলম, বড়গাছী,
পবা, রাজশাহী।

বাংলার প্রাণে প্রাণে সবুজের কোণে কোণে,
পুনরায় জ্বলুক ইসলামের জ্যোতি।
তাওহীদ-রিসালাতে এক হোক উম্মাত,
ঘুঁচে যাক আঁধারের অমানিশা কালো রাত।
আল্লাহ্‌র সে বিধান খেলাফত যার নাম,
বয়ে আনে ইনছাফ, জান্নাতী পয়গাম।
বিভেদ-প্রাচীর ভেঙে, মুমিন-মুসলিম সবে,
সাম্যের ছায়াতলে মিলাও হাতে হাত।
আসুক অহি-র নূর হোক অমানিশা দূর,
জীবন-পাথেয় হোক সুন্নাহ্‌র কোহিনূর।
মানব রচিত তন্ত্র ও মন্ত্র যত,
ছিন্ন করে আনো অহি-র আবে হায়াত।
জাগো বাংলাদেশ! শোন মিনারের ডাক,
ফজর হয়েছে হেথা হাতে নাও মিসওয়াক,
ওযূর পানিতে ধোও কুফরের তন্ত্র
ঐ দেখ দূর থেকে হাঁকছে খিলাফত।

মনের রূপ

-মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বহুরূপী মন উদ্ভ্রান্ত উড়ন্ত বলাকা
কখনও সাইমুমের সাথে পাল্লা কাটে,
আছড়ে পড়ে গাঁঢ় কালো হিমাদ্রীর কোলে।
কখনও মুক্ত বিহঙ্গ সম ডানা মেলে
ওড়ে নীলিম নিঃসীমে।
কখনও রূপসীর মায়াবি হাতছানিতে
ফিরে এসে প্রত্যাখ্যাত হয়।
কখনও উড়তে চায় মধু মক্ষিকা হয়ে,
পুষ্প পাঁপড়ির রেণু মেখে।
কখনও ফুলপরীদের সাথী হ'তে চায়।
নিদারুণ সেলাহত ব্যথা নিয়ে
কাতরায় অনুক্ষণ।
প্রেয়সীর প্রত্যারিত বিষাক্ত কষাঘাতে।
বিদগ্ধ মন হিসাবের খতিয়ানে
খুঁজতে থাকে অংকের জীবন গণিত।
অতীত ও বর্তমানের
ব্যর্থ আশার প্রত্যাশী
গরমিলে অমিল সবি।
ডুবন্ত ভানুর রক্তিমতায় চকিতে চাহি
আগামীর জীবন বেলায় দাঁড়িয়ে
দূরের নিঠুর হাতছানিতে
শিহরণ জাগে মনের কপাটে।
এলোমেলো আর গরমিলের অংকগুলি
সংকিত করে বহুরূপী মনের।
চকিতে চমকে উঠি
অদৃশ্যের হাতছানিতে।

গণতন্ত্র

-ছিয়াম খান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

এই গণতন্ত্র!
শিরকের মন্ত্র, কুফরীর তন্ত্র।
ন্যায়-নীতির নেই ছিটাফোঁটা,
নৈতিকতা হয় ঝাঁটাপেটা।
এই তো শুধু গণতন্ত্রের গুণ,
কথায় কথায় হবে বেকছুর খুন।
বিশ্ব-মানবতার কবরস্থান,
এই তো তোমার গণতন্ত্রের দান।
নীতির চেয়েও হেথা নেতা বেশী,
বলতে গেলে জেল, নয়তো ফাঁসি।
বস্তাপঁচা গণতন্ত্র ছুঁড়ে
ফেলে দাও দুনিয়ার আঁস্তাকুড়ে।
মুসলিম ভাই ভাই মিলে সবে,
খিলাফত কায়েম করতে হবে।
খিলাফত যদি কায়েম করতে পারি,
থাকবে না আর কোন আহাজারী।

বাঙ্গালিয়ানা

-আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম
বাগমারা, রাজশাহী।

এটা কি বাঙ্গালিয়ানা?
হিন্দুর মত নাচ-গান আর শুধুই বেহায়াপনা!
হাযার বছরের ঐতিহ্য বলে চালিয়ে দাও,
মোঘল আমলে ছিল কিনা তা একবার বলে যাও।
তোমরা শুধু বাঙালী নও তোমরা মুসলিম জাতি,
বাঙ্গালীপনায় করো না ভাই ঈমানের ক্ষয়-ক্ষতি।
এই অপসংস্কৃতি মেনে চলো কোন্ ঐতিহ্যের টানে,
যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন পবিত্র কুরআনে!
একবারও কি ভেবে দেখতে ইচ্ছে হয় না ভাই!
মুসলিম হয়ে কার পিছে পিছে ছুটছো তুমি কোথায়?
তাহ'লে এগুলো কোথা থেকে এল বল!
ঐ যে হিন্দু নেতারা এদেশে চালু করে দিয়ে গেল।
তাহ'লে কেন পালন করছ এই হিন্দুয়ানী প্রথা?
কুরআনে দেখ এই বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র কথা।
কুরআন বলে, বিজাতির তুমি করো না অনুসরণ,
কাফের-মুশরিক হবে না কভু তোমাদের আপনজন।
তাই বলি ভাই, হিন্দু হয়ো না, তুমি তো মুসলমান,
ইতিহাস খুলে পড়ে দেখ তব ইতিহাস-অম্লান।
কিসের এসব হাযার বছর? হিন্দুয়ানী রীতি?
এসব মেনে করো না তুমি ঈমানের ক্ষয়-ক্ষতি।

স্বদেশ

চলে গেলেন তিন সহস্রাধিক কবর খননকারী আলোচিত গোরখোদক মনু মিয়া

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপযেলার আলোচিত গোরখোদক মুহাম্মাদ মনু মিয়া আর নেই। মানুষের শেষ ঠিকানার এই নিঃস্বার্থ কারিগর ৬৭ বছর বয়সে নিজেই ঠাঁই নিলেন কবরে। স্থানীয় প্যানেল চেয়ারম্যান বাহাউদ্দীন বলেন, শারীরিক অসুস্থতায় ঢাকায় চিকিৎসাধীন থাকার সময় গত মে মাসের মাঝামাঝি তার নিত্য সফরসঙ্গী ঘোড়ার মৃত্যুর পর থেকেই মনু মিয়া শারীরিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

মনু মিয়া দীর্ঘ ৪৯ বছরের কর্মজীবনে কোন ধরনের পারিশ্রমিক কিংবা বখশিশ না নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে ৩ হাযার ৫৭টি কবর খনন করেছেন। তিনি অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত কারো মৃত্যু সংবাদ কানে আসা মাত্রই খুন্তি, কোদাল, ছুরি, করাত, দা, ছেনিসহ কবর খননের সহায়ক সব যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটে যেতেন।

তার কবরস্থানে ছুটে চলার দীর্ঘদিনের নিত্য সঙ্গী ছিল বাহাদুর নামের একটি ঘোড়া। কিন্তু মনু মিয়া অসুস্থ হয়ে ঢাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সুযোগে বাড়ি থেকে ঘোড়াটিকে নিয়ে হত্যা করে ফেলে যায় কিছু লোক।

মনু মিয়া শুধু কবর খনন করেই ক্ষান্ত হ'তেন না, এ পর্যন্ত যাঁদের কবর খুঁড়েছেন তিনি, তাদের মৃত্যুর দিন-তারিখ সব লিখে রাখতেন নিজের ডায়েরিতে।

[আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম জাযা দান করুন (স.স.)]

দেড় দশকের মধ্যে এসএসসিতে সর্বোচ্চ ফল বিপর্যয় : নেপথ্যে কারণ কি?

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের ফলাফলে অনেকটাই ধস নেমেছে। গত বছর থেকে পাসের হার কমেছে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ কমেছে ৪৩ হাযার ৯৭ জনের। গত এক যুগে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে এমন ধস দেখা যায়নি। ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গণিত বিষয়ে বড় ধরনের ফল বিপর্যয় ঘটেছে। পাসের হার কম ছিল ইংরেজীতেও। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে বিপর্যয় ঘটেছে সামগ্রিক ফলাফলে। সব মিলে ধস নেমেছে এসএসসি ও সমমানের ফলাফলে। শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আওয়ামী শাসনামলের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের এ আমলে এসএসসির খাতা মূল্যায়নে পরীক্ষকদের ছিল না ওভার মার্কিং বা গ্রেস নম্বর দেওয়ার সুযোগ। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন হয়েছে যথাযথভাবে। এর ফলে পাসের হার কমেছে অনেক।

ঢাকার চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. খন্দকার এহসানুল কবীর বলেন, 'এবার কোন ধরনের বাড়তি নম্বর বা গ্রেস মার্কস কাউকে দেওয়া হয়নি। মেধার প্রকৃত মূল্যায়নের শতভাগ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। পরীক্ষকদেরও সেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল'।

তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে কড়াকড়ি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, খাতা মূল্যায়নে স্বল্প সময়, শিক্ষার্থীদের লার্নিং গ্যাপ, বারবার কারিকুলাম পরিবর্তনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে ঘাটতি এই বিষয়গুলো এবারের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে।

বোর্ডভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এবার এসএসসিতে রাজশাহী বোর্ডে সর্বোচ্চ ৭৭ দশমিক ৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে আর বরিশাল বোর্ডে পাস করেছে মাত্র ৫৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। অথচ গত বছরেও বরিশাল বোর্ডে পাস করেছিল ৮৯ দশমিক ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী।

বিনা বিচারে ৩০ বছর কারাভোগের পর মুক্তি পেলেন হবিগঞ্জের কানু মিয়া

কোন ধরনের সাজা ছাড়াই ৩০ বছর হবিগঞ্জ কারাগারে বন্দী ছিলেন কানু মিয়া (৫০)। মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় মাকে হত্যা মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন। দুই দশক আগে আদালত মামলার কার্যক্রম স্থগিত করলেও কানু মিয়া মুক্তি পাননি। সম্প্রতি কারাগার পরিদর্শনে গিয়ে বিষয়টি যেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তার নযরে আসে। পরে তাদের সহায়তায় ও আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি।

জানা যায়, কানু মিয়া মানসিক রোগী ছিলেন। তিনি ১৯৯৫ সালে তার মাকে ঘরে থাকা একটি কোদাল দিয়ে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তখন গ্রামবাসী তাকে আটক করে পুলিশে দেয়। এ ঘটনায় মামলা চলাকালে কানু মিয়া আরও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। ২০০৩ সালের দিকে আদালত এক আদেশে বলেন, কানু মিয়া সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত মামলার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। সেই থেকে কারাগারে আছে কানু মিয়া।

সম্প্রতি যেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা কারাগার পরিদর্শনে গেলে কানু মিয়া তাঁর নযরে আসে। জানতে পারেন মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত। এমনকি মামলার বাদীরও কোন সন্ধান নেই। পরে তার ব্যবস্থাপনায় কানু মিয়ার যামিন হয়।

কানু মিয়ার মুক্তির খবর পেয়ে বড় দুই ভাই মামলার বাদী মুনু মিয়া ও নাসু মিয়া কারা ফটকে আসেন। নাসু মিয়া বলেন, আমরা ধরে নিয়েছিলাম, আমাদের ভাই হয়তো আর বেঁচে নেই। যে কারণে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারিনি।

[দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা থাকলে হয়ত এরূপ অবস্থা হ'ত না (স.স.)।]

গত ৩৫ মাসের মধ্যে জুন মাসে সর্বনিম্ন মূল্যস্ফীতির হার ৮.৪৮ শতাংশ

গত জুনে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৮.৪৮ শতাংশ হয়েছে, যা বিগত ৩৫ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০২২ সালের জুলাইয়ে ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ মূল্যস্ফীতি হয়েছিল। এরপর গত জুনের মতো এত কম মূল্যস্ফীতি আর হয়নি। গত ৭ই জুলাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জুনের মূল্যস্ফীতির চিত্র প্রকাশ করেছে। বিবিএস বলছে, গত জুনে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ। আর খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয় ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি এক ধরনের করের মতো। ধরুন, আপনার প্রতি মাসে আয়ের পুরোটাই সংসার চালাতে খরচ হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম বাড়লে এবং সে অনুযায়ী আপনার আয় না বাড়লে আপনাকে ধারদেনা করে সংসার চালাতে হবে কিংবা খাবার, কাপড়-চোপড়, যাতায়াতসহ বিভিন্ন খাতে কাট-ছাঁট করতে হবে। মূল্যস্ফীতির চেয়ে মজুরি বৃদ্ধি বা আয় বৃদ্ধি কম হ'লে সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়ে। প্রকৃত আয় কমে যায়। এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফীকুল আলম জানিয়েছেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের সুচিন্তিত নীতি-কৌশলের ফলে মূল্যস্ফীতি দ্রুত কমছে'।

খরচ কম হওয়ায় সরকারী মাধ্যমের হাজীদের প্রায় ৯ কোটি টাকা ফেরত দেয়া হবে!

সরকারী মাধ্যমের ৪,৯৭৮ জন হাজীকে প্রায় ৯ কোটি টাকা ফেরত দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, 'আমরা এ বছর হজ্জ প্যাকেজে বাড়ি ভাড়ার জন্য যে পরিমাণ টাকা ধার্য করেছিলাম, তার চেয়ে কিছু কম রেটে বাড়ি ভাড়া পেয়েছি। কোন কোন ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জও কিছুটা কমেছে। এরই মধ্যে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চূড়ান্ত করেছি। সরকারী মাধ্যমে প্রত্যেক হাজীকে আমরা প্যাকেজের উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত দেব। সে হিসাবে ৪,৯৭৮ জন হাজীকে আমরা সর্বমোট ৮ কোটি ২৮ লাখ ৯০ হাজার ১৮৩ টাকা ফেরত দেব। যত দ্রুত সম্ভব এই টাকা হাজীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত পাঠানো হবে।

[কর্তৃপক্ষকে এ প্রশংসনীয় কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই (স.স.)।]

বিদেশ

ইতিহাসের ব্যয়বহুল সম্মেলন, মিনিটে ব্যয় সোয়া ১৪ কোটি টাকা!

নেদারল্যান্ডসের হেগে অনুষ্ঠিত এবারের ন্যাটো সম্মেলনকে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বলা হচ্ছে। গত ২৫শে জুন নেদারল্যান্ডস টাইমস ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। সেখানে বলা হয়, ন্যাটো সম্মেলনের জন্য হেগ শহরকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়। নিয়োজিত করা হয় পুলিশের প্রায় ২৭ হাযার সদস্য এবং সামরিক বাহিনীর ১০ হাযার সদস্য।

নিরাপত্তা, লজিস্টিকস, পরিবহন, প্রযুক্তি ও অতিথি আপ্যায়ন সব মিলিয়ে মাত্র আড়াই ঘণ্টার এই আয়োজনে ব্যয় হয়েছে বাংলাদেশী মুদ্রায় দুই হাযার ১৪৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকা, যা মিনিট প্রতি প্রায় ১৪ কোটি ২৭ লাখ ৪০ হাযার টাকা। এবারের সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ইরান-ইস্রাঈল সংঘাত, ইউক্রেন যুদ্ধ, রাশিয়ার হুমকি ও ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর পরিকল্পনা। ন্যাটো সম্মেলনের এমন ব্যয়বহুল আয়োজন নিয়ে ইউরোপজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। ডাচ সংসদের কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন, এই অর্থ কি স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো খাতে ব্যয় করা যেত না?

[অজনপ্রিয় নেতাদের জন্য এই বিলাসী আয়োজন নিঃসন্দেহে অপরাধ (স.স.)]

ইউরোপে তাপপ্রবাহে ১০ দিনে ২৩০০ মৃত্যু

গত ২৩শে জুন থেকে ২রা জুলাই পর্যন্ত ১০ দিনে ২,৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। একটি নতুন গবেষণা অনুসারে, উপরোক্ত মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। ঐ ১০ দিন স্পেনে তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানেও দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ঐ গবেষণায় বলা হয়েছে।

গবেষণার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি ইম্পেরিয়াল কলেজ লণ্ডনের প্রভাষক গ্যারিফ্যালোস কনস্টান্টিনোডিস বলেন, 'মাত্র দুই বা চার ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি হাযার হাযার মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে। এই কারণেই তাপপ্রবাহ নীরব ঘাতক হিসাবে পরিচিত। অধিকাংশ তাপ-সম্পর্কিত মৃত্যু জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে বাড়ি ও হাসপাতালে ঘটে এবং খুব কমই তা রিপোর্ট করা হয়'।

[জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৭০ ভাগ বেশী উত্তপ্ত। অতএব হে মানুষ! তাপ ও চাপের মালিক যিনি তাঁকে ভয় কর (স.স.)।]

বিশ্বে যেসব দৈনিক পত্রিকার পাঠক সর্বাধিক

সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে সমাজের অসংগতি তুলে ধরে সংবাদমাধ্যম। পাঠকের আস্থা ও জনপ্রিয়তার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যম বছরের পর বছর ধরে টিকে আছে। নিম্নে বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত কিছু সংবাদমাধ্যমের তালিকা তুলে ধরা হ'ল। দৈনিক পাঠকের সংখ্যার ভিত্তিতে এই তালিকা করা হয়েছে।

(১) দ্য নিউইয়র্ক টামইস : বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পত্রিকার তালিকায় শীর্ষে আছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরে অবস্থিত সংবাদপত্রটি ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুদ্রিত সংস্করণ দিয়ে শুরু হ'লেও বর্তমানে এটি সফলভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে অনলাইনে বিশ্বের সর্বোচ্চ সাবস্ক্রাইবার (গ্রাহক) রয়েছে এ সংবাদমাধ্যমের। বর্তমানে ছাপা পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ৬ লাখ ২০ হাযার। অন্যদিকে পত্রিকাটির ডিজিটাল গ্রাহক ১ কোটি ৫ লাখ। পত্রিকাটির অনলাইনে দৈনিক গড়ে ৪১ লাখ নতুন পাঠক আসেন।

ছাপা পত্রিকা থেকে পাঠকের অভ্যাস অনলাইনে স্থানান্তরের বিষয়টি দ্রুতই বুঝতে পারে সংবাদমাধ্যটি। ফলে ২০১১ সালে বিজ্ঞাপননির্ভর আয়ের বদলে সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক আয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। ফলে খুব অল্প সময়েই সাবস্ক্রিপশন থেকে তাদের আয় বিজ্ঞাপনের আয়কে ছাড়িয়ে যায়।

(২) জাপানিজ ভাষায় প্রকাশিত **ইয়োমিউরি শিমবুন**। ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকাটি ছাপা পত্রিকা হিসাবে ১ নম্বর স্থান দখল করেছে। এটি প্রতিদিন ৭৭ লক্ষ কপি প্রিন্ট এবং সার্কুলেশন হয়। তবে এর অনলাইন গ্রাহকের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই।

(৩) আসাহি শিমবুন : জাপানের ওসাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির মুদ্রণ সংখ্যা ৫২ লাখ। **(৪) দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল :** যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকাটির সার্কুলেশন ৬ লাখ ১০ হাযার। ডিজিটাল গ্রাহকসংখ্যা ৪৩ লাখ। **(৫) দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট :** ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। পত্রিকাটির ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন ২৫ লাখ। প্রতিদিন গড়ে ২০ লাখ ইউনিক পাঠক অনলাইনে পত্রিকাটি পড়ে থাকেন।

তারপর **(৬)** ভারতের দৈনিক ভাস্কর (প্রচারসংখ্যা ৩১ লাখ), **(৭)** জার্মানির বিল্ড (প্রচারসংখ্যা ৩০ লাখ), **(৮)** যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক ১৮২১ সালে প্রতিষ্ঠিত দ্য গার্ডিয়ান (প্রায় ৩৫ লাখ), **(৯)** যুক্তরাজ্যের দ্য ডেইলি মেইল (প্রায় ৩৫ লাখ), **(১০)** ভারত থেকে প্রকাশিত দ্য টাইমস অব ইণ্ডিয়া (প্রায় ৩৪ লাখ)।

মুসলিম জাহান

১ ট্রিলিয়ন ডলার বা ১১৮ লাখ কোটি টাকা মূল্যের খনি, তালেবানের হাতে আফগানিস্তানের নতুন অস্ত্র

ক্ষমতা ফিরে পাবার পর খনিজ সম্পদের প্রতি নযর বাড়িয়েছে তালেবান সরকার। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনৈতিক দর

কষাকষির উপায় হিসাবে ব্যবহার করছে মূল্যবান খনিজের সংগ্রহকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের তথ্য বলছে, এসব খনিজ সম্পদের মূল্য ১ ট্রিলিয়ন ডলার। দেশটির ৩৪টি প্রদেশের ১৪শ'র বেশী মওজুদ শনাক্ত করা হয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র আকরিক লোহা মওজুদ ২ বিলিয়ন মেট্রিক টন। লোগার প্রদেশে তামার মওজুদ রয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ টন। বাজারে মূল্য ৫০ বিলিয়ন ডলার। রয়েছে লিথিয়াম ও ৪৭টি তেল কূপের মওজুদও।

খনিজ সম্পদের ব্যবহার করে এরই মাঝে প্রায় ১০ বিলিয়ন অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে দেশটি। রয়েছে ৭ বিলিয়ন ডলারের অধিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগও। যেখানে কর্মসংস্থান হয়েছে দেড় লাখের অধিক নাগরিকের। মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে চীন, রাশিয়া, ইরান, পাকিস্তান ও ভারতের মতো দেশগুলোর।

দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে ২৫ বছরের তেল উত্তোলন চুক্তি করে এগিয়ে রয়েছে বেইজিং। রয়েছে তামা খনি প্রকল্পও। আলোচনায় আরেক মূল্যবান খনিজ লিথিয়াম। তামা, লোহা ও ইউরেনিয়ামের সরবরাহ ও উত্তোলনে কাজ চলছে ভারতের সঙ্গেও। তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে সহায়তা দিচ্ছে রাশিয়া। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মধ্যস্থতাকারী দেশ ইরান। সব মিলিয়ে, আফগানরা খনিজ সম্পদকে শুধু আয় নয়, বরং নিজেদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলাতে ব্যবহার করছে।

[বাংলাদেশের মাটির নিচে, নদী-সমুদ্রে এবং সুন্দরবনে রয়েছে অঢেল সম্পদ। কেবল সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন (স.স.)।]

২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক ৩ কোটি

মাসজিদুল হারামে গত এক বছরে ২ কোটি হজ্জ-ওমরাহ পালনকারীদের সেবা প্রদান

পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালন করতে মসজিদুল হারামে প্রতি বছর লাখো মানুষ আসেন। সম্প্রতি সঊদী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৪৪৬ হিজরী সনে (২০২৪-২৫ খৃ.) মাসজিদুল হারামে আগত দু'কোটিরও অধিক হজ্জ-ওমরাহ পালনকারী উন্নত ও সুশৃঙ্খল সেবা গ্রহণ করেছেন। ২০২৩-২৪ সালে যা ছিল ১ কোটি ৩০ লাখের কিছু বেশী। সঊদী কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত ১ বছরে ৩২ লাখ ৮০ হাযারের বেশী মানুষ কার্ট সেবা (চালক-চালিত হুইল চেয়ার বা যানবাহন) গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও ২ লাখ ২৭ হাযারের অধিক মানুষ লাগেজ সংরক্ষণের সুবিধা নিয়েছেন।

সঊদী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা পবিত্র দুই মসজিদে আগত হজ্জ ও ওমরাযাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও মানবিক সেবার সমন্বয়ে উচ্চমানের পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ধরনের সেবাগুলোর পরিসর আরও বাড়ানো হবে এবং বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য হজ্জ ও ওমরাহ্র অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও সম্মানজনক করে তোলা হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৩ কোটির অধিক মানুষের হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে দেশটি।

এ লক্ষ্য অর্জনে নেওয়া হয়েছে নানা রকম কৌশলগত বিনিয়োগ ও নীতিগত সংস্কার। এর মধ্যে রয়েছে মাসজিদুল হারামের ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে ২৫ লাখ করা এবং হজ্জযাত্রীদের চলাচল সহজ করতে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এমআইটির নতুন আবিষ্কার : বাতাস থেকেই তৈরি হবে খাবার পানি

আজকের বিশ্বে প্রায় ২২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানির অভাবে দিন কাটান। শুধু আমেরিকাতেই প্রায় ৪৬ মিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানি পান না। এই বাস্তবতায় এমআইটির বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন এক অবিশ্বাস্য যন্ত্র, যেটি চলার জন্য বিদ্যুৎ বা সৌর শক্তির দরকার হয় না। কিন্তু এটি বাতাস থেকে পানির বাষ্প শুষে বিশুদ্ধ পানি তৈরি করতে পারে। যন্ত্রটির নাম 'অ্যাটমোসফেরিক ওয়াটার হারভেস্টার'। এটি প্রথমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে শুষ্ক অঞ্চল ডেথ ভ্যালি-তে পরীক্ষামূলকভাবে সফলভাবে চালানো হয়েছে। দিনে এটি ১৬০ মিলিলিটার পর্যন্ত পানি সংগ্রহ করতে পারে, যা ভবিষ্যতে কয়েকটি প্যানেল একত্রে বসিয়ে একটি বাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় পানি জোগান দিতে পারবে।

যন্ত্রটি তৈরি হয়েছে বিশেষ এক ধরনের 'হাইড্রোজেল' দিয়ে একটি জেল জাতীয় পদার্থ, যা দেখতে ছোট ছোট কালো ডোম আকৃতির। এটি বাতাসের পানি বাষ্প শুষে নেয়। পরে এই বাষ্প ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে ঘনীভূত হয়ে পানি হয়ে নীচে পড়ে যায় এবং একটি পাইপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। এ পানির গুণমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিরাপদ মাত্রার নীচে রয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান গবেষক অধ্যাপক শুয়ানহে ঝাও বলেন, 'আমরা এমন এক যন্ত্র বানিয়েছি, যা কোন রকম বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ করতে পারে। মরুভূমি, দারিদ্রপীড়িত এলাকা বা গ্রামে যেখানে সৌরপ্যানেলও মেলে না, সেখানেও এটি চালানো যাবে'।

তারা এখন এই প্রযুক্তিকে বড় পরিসরে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছেন, যাতে একটি পরিবার বা এমনকি একটি গ্রামের পানির প্রয়োজন মেটানো যায়।

জিন থেরাপির মাধ্যমে শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়ার কৌশল আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা

জিন থেরাপির মাত্র এক ডোজ ওষুধের মাধ্যমে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মানুষের দুর্বল শ্রবণশক্তি ভালো করা যাবে। এ কৌশল আবিষ্কার করেছেন সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের দাবী, এই অত্যাধুনিক থেরাপি জন্মগত বধিরতা বা দুর্বল শ্রবণশক্তির শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রবণশক্তি উন্নত করতে সক্ষম। ইতিমধ্যে একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সাত বছর বয়সী একটি শিশু প্রায় সম্পূর্ণ শ্রবণশক্তি ফিরে পেয়েছে।

বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ওটিওএফ জিনের মিউটেশনের কারণে প্রোটিন ওটোফারলিনের ঘাটতি তৈরি হয়। তখন কান থেকে মস্তিষ্কে শব্দের সংকেত ঠিকমতো পাঠানো না যাওয়ায় বধিরতা তৈরি হয় অনেকের। গবেষণায় দশজন দুর্বল শ্রবণশক্তির ব্যক্তির কানে ইনজেকশনের মাধ্যমে ওটিওএফ নামের একটি জিনের কপি প্রবেশ করানোর পর তাঁদের শ্রবণশক্তি দ্রুত ভালো হ'তে দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত এই থেরাপি শিশুদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে।

[আল্লাহ বান্দাদের কল্যাণে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রয়োজন কেবল গবেষণার (স.স.)।]

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৫

নতুন বাংলাদেশ গঠনে ইসলাম-ই হোক রাষ্ট্রচেতনা!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা ১২ই জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত ঢাকার রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা ছিল ইসলাম। সেই চেতনার উপরেই বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে। নইলে একদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা হারিয়ে যাবে। তিনি বলেন, এদেশের প্রকৃত শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কিংবা গণতন্ত্র নয়, বরং ইসলামী খেলাফতের রাজনীতিই হ'তে পারে একমাত্র বিকল্প। এ লক্ষ্যে সকল ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী খেলাফতের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা জাতির সামনে উপস্থাপন করার জন্য তিনি জোরালো আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, 'যুবসংঘ' এদেশের শান্তিপ্রিয় যুব সংগঠন। তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এদেশে দাওয়াতী কার্যক্রম জোরালোভাবে চালিয়ে যাবে এটাই আমাদের কামনা।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম এবং 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম প্রমুখ।

সম্মেলনের একপর্যায়ে তুরস্ক ভিত্তিক সমাজকল্যাণ সংস্থা জমঈয়াতুত তাকাফুল লি আয়তামি ফিলিস্তীন-এর ডাইরেক্টর লেবাননী বংশদ্ভূত ড. দানিয়েল হাসান বাছবূছ আগমন করেন এবং ফিলিস্তীনের বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেন। এসময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপক ফিলিস্তীনী বংশদ্ভূত জনাব হুসামুদ্দীন এদান এবং লন্ডনস্থ মানবাধিকার সংস্থা কেজ ফাউণ্ডেশন-এর ব্যবস্থাপক জনাব মুহাম্মাদ রব্বানী। তাঁরা ফিলিস্তীনে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে বিভিন্ন মহলের সাথে মতবিনিময়ের জন্য বাংলাদেশ সফররত ছিলেন। এছাড়া সম্মেলনে পিস টিভির আলোচক, বায়তুল মা'মূর মসজিদ, ঢাকার সম্মানিত খতীব জনাব হাসান জামিল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন।

এতদ্ব্যতীত 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ড. ইহসান ইলাহী যহীর, বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, টাঙ্গাইল যেলা সভাপতি আব্দুল হামীদ, গাযীপুর-উত্তর যেলা সভাপতি শরীফুল ইসলাম, খুলনা যেলা সভাপতি আল-আমীন, রংপুর-পশ্চিম যেলা সভাপতি মুতীউর রহমান, দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা সভাপতি মীযানুর রহমান, সিলেট যেলা সভাপতি তোফায়েল আহমাদ, জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর-এর শিক্ষার্থী 'যুবসংঘে'র কর্মী মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আকরাম হোসাইন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মুদ্দাছ্ছির ছাকিব প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও নারায়ণগঞ্জ যেলার ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয ওমর ফারূক। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), ইয়াকূব আলী (মেহেরপুর), কেরামত আলী (পাবনা), মীর বখতিয়ার (যশোর)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান ও দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণও উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সম্মেলনের সভাপতি কর্তৃক মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে মাগরিবের প্রাক্কালে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশ করা হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ প্রস্তাবনা পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলে তা সমর্থন করেন।-

১. জুলাই'২৪-এর অভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পুনর্গঠন করতে হবে।

২. বৃটিশদের চালুকৃত বিচারব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে এবং বিচারের নামে অবিচার, দীর্ঘসূত্রিতা, আইনের অপব্যবহার ও পক্ষপাতিত্ব থেকে আদালত ও বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে অবিলম্বে শারঈ বিচারব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩. এই সম্মেলন সম্প্রতি ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে দলীয় রাজনীতির নির্মম শিকার সকল হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সেই সাথে পশ্চিমাদের চালানকৃত শিরকী গণতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে।

৪. প্রাথমিক হ'তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের বর্তমান সিলেবাস সংস্কার করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৫. শিক্ষার সকল স্তরে প্রচলিত সহশিক্ষা বাতিল করতে হবে এবং নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. কোটা প্রথার পরিবর্তে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সকলকে সমানভাবে দেশ সেবার সুযোগ দিতে হবে।

৭. অফিস-আদালত থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি কঠিন হস্তে দমন করতে হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিজ্ঞ আলেমদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে।

৮. অসাধু সিণ্ডিকেট ও খাদ্যে ভেজাল প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৯. যুবসমাজকে বিদেশমুখী না করে দেশেই উত্তম কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

১০. বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে দেশে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার অবাধ প্রসার বন্ধ করতে হবে এবং শহর ও গ্রামের সর্বত্র মদ, জুয়া, চাঁদাবাজী এবং লটারী প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. ইসলামের নামে প্রচলিত বিভ্রান্ত দলসমূহ যেমন আহলে কুরআন, কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, হিজবুত তাহরীর, দেওয়ানবাগী প্রভৃতি ফের্কার প্রতিরোধে সরকারীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১২. এই সম্মেলন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইস্রাঈলের পাশবিক আগ্রাসনের শিকার অসহায় ফিলিস্তীনী মুসলমানদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং বাংলাদেশ সরকারকে সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে ইস্রাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছে।

সম্মেলনের অন্যান্য খবর :

কর্মী উপস্থিতি : দেশের সকল যেলা থেকে প্রায় দেড় হাযার কর্মী ও সুধী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মূল অডিটোরিয়ামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাইরে চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

স্টল সমূহ : সম্মেলনে সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত মিলনায়তনের বাইরে মূল গেইটের ডান পার্শ্বে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিং পরিচালনা করেন ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ যেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৪৫ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনার' তালিকাভুক্ত হন।

এছাড়াও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ', বিক্রয় বিভাগের জন্য বুকস্টল ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সংগঠনের পরিচিতি বিষয়ক স্টল স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে বই, সংগঠনের পরিচিতি, গঠনতন্ত্র, মনোগ্রাম সম্বলিত গেঞ্জি, চাবির রিং, কলম ও প্যাড ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সৌজন্য বৈঠক

৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ৩ জুলাই বাদ আছর 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজীবুর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠনটির একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগমন করেন। এসময় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাদেরকে স্বাগত জানান। 'জামায়াতে ইসলামী'র প্রতিনিধি দলটি বিগত ২০০৫ সালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উপর তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত সরকারের কারানির্যাতন ও বিভিন্ন যুলুমের ব্যাপারে অনুতাপ ও দুঃখপ্রকাশ করেন। আমীরে জামা'আত তাদেরকে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থার পরিবর্তে নবীদের তরীকায় ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালীম, কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল সম্পাদক শাহাবুদ্দীন, মাসিক পৃথিবী পত্রিকার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সামীউল হক ফারূকী, ঢাকার তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুফতী ড. খলীলুর রহমান মাদানীসহ ৫ জন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল এবং যেলা ও স্থানীয় প্রায় ২৫ জন নেতাকর্মী।

অপরদিকে 'আন্দোলন'-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক ড. আব্দুল হালীম প্রমুখ দায়িত্বশীলবৃন্দ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে হাদীছ ফাউণ্ডেশনের চার গবেষকের প্রবন্ধ উপস্থাপন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের উদ্যোগে রাবি সিনেট ভবনে গত ২৫ ও ২৬শে জুন দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (হাফাবা) গবেষণা বিভাগের ৪ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে হাফাবা গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব 'আধুনিক শিক্ষা কাঠামোতে হাদীছ পাঠদানের উদ্ভাবনী পন্থাসমূহ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত', আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ও হাফাবার সিনিয়র গবেষণা সহকারী ড. নূরুল ইসলাম أحمد حسن الزيات : منهجه في كتابة تاريخ الأدب العربي (আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি), হাফাবা গবেষণা সহকারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ 'বাংলাদেশে আরবী অলংকারশাস্ত্র পাঠদান পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা' এবং হাফাবা গবেষণা সহকারী ও রাবির ফার্সী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক আব্দুর রঊফ 'ফারসী ভাষায় কুরআন অনুবাদে শাহ অলিউল্লাহর গৃহীত নীতি : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে গবেষণাপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

'Issues Around Pedagogy : Teaching- Learning Strategies in Arts and Humanities for the 21st Century' শীর্ষক এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রাবি কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাবির মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সালেহ হাসান নকীব। এছাড়া বিদেশী অতিথিদের মধ্যে জাপান, মালয়েশিয়া, নেপাল ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রফেসরগণ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সম্মেলনে ৯টি ভেন্যুতে ৩৬টি সেশনে মোট ২১৬টি গবেষণাপ্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এতে ১৩টি দেশের ৪ শতাধিক গবেষক অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রত্যেক প্রবন্ধ উপস্থাপককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষা ২০২৫-এর ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী :

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় ৩৭ জন ছাত্র ও ৪২ জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ৭৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৪ জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ৬ জন্য গোল্ডেন A+), ৪৪ জন A ও ১ জন A-গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার শতভাগ।

সাধারণ বিভাগ থেকে মোট ৩০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে ১৫ জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ১জন্য গোল্ডেন A+) এবং ১৫ জন A গ্রেড পেয়েছে। ৩৪ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে ৯ জন জিপিএ ৫ (A+), ২৪ জন A গ্রেড ও ১ জন A-গ্রেড পেয়েছে।

আর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এ বছর ৭ জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৪জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ১জন্য গোল্ডেন A+) ও ৩ জন A গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৮ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৬ জন জিপিএ ৫ (A+) (এর মধ্যে ৪ জন্য গোল্ডেন A+) ও ২ জন A গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা :

২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ২৭ জন শিক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫ জন জিপিএ ৫.০০ (A+), ১৪ জন (A), ৭ জন A-গ্রেড ও ১ জন (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাবেক সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর মৃত্যু

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাবেক সিনিয়র নায়েবে আমীর, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সাবেক প্রিন্সিপাল শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (৮৭) বার্ধক্যজনিত কারণে রাজশাহী লক্ষ্মীপুরস্থ সিডিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৮ই জুন বুধবার বিকাল ৬-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরদিন সকাল ৮-টায় রাজশাহী যেলার পবা উপযেলাধীন আল-জামি'আহ আস-সালাফিইয়াহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী জামে মসজিদে তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বেলা ১১-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী সংলগ্ন রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে তার দ্বিতীয় জানাযা এবং দুপুর ১.৩০ মিনিটে তার নিজগ্রাম রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপযেলাধীন সারাংপুর ঈদগাহ ময়দানে তৃতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। দ্বিতীয় জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ** সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আব্দুল্লাহ ফারূক সালাফী, 'আহলেহাদীস জামা'আত'-এর আমীর ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, মারকাযের শিক্ষক মণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ী উপযেলার সারাংপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলার আলাতুলী ইউনিয়নে। দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পর তিনি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রথমে পাকিস্তানের লায়ালপুর (ফয়ছালাবাদ)-এ অবস্থিত জামে'আ সালাফিইয়াহ এবং পরে সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং সেখান থেকে লিসান্স ডিগ্রী অর্জন করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভের পরপরই তিনি সঊদী সরকারের মাবঊছ (দাঈ) হিসাবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এর মধ্যে গাইবান্ধা যেলার মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় তিনি মুহাদ্দিছ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। রাজশাহীর রাণীবাজারে অবস্থিত মাদ্রাসা ইশা'আতুল ইসলাম আস-সালাফিইয়াহতে অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯৯১ সালে নওদাপাড়া, রাজশাহীতে তাওহীদ ট্রাস্টের অধীনে 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি এর প্রথম প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতঃপর ২০০৯ সাল পর্যন্ত টানা ১৯ বছর এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সর্বশেষ আল-জামি'আহ আস-সালাফিইয়াহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী-এর সিনিয়র মুহাদ্দিছ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি প্রথমে বাংলাদেশ 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, অতঃপর ১৯৯৪ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাথী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় দেশের আনাচে-কানাচে দাওয়াতী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তাওহীদ ট্রাস্টের সদস্য হিসাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন। ২০০৫ সালে তিনি আমীরে জামা'আতের সাথে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় কারাবরণ করেন এবং সাড়ে ষোল মাস কারানির্যাতন ভোগ করেন। ২০০৯ সালে রাজনৈতিক দল গঠন কেন্দ্রিক মতপার্থক্যের কারণে 'আহলেহাদীস জামা'আত' নামে পৃথক একটি সংগঠনের জন্ম হ'লে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং আমৃত্যু উক্ত সংগঠনের আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ তাঁর গুনাহখাতা মাফ করুন, তাঁর দ্বীনী খেদমত কবুল করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন।-আমীন! *(সম্পাদক)*।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : হজ্জ পালনকালে জনৈক হাজী অন্য একজনকে কুরবানী করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে জানতে পারেন যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কুরবানী করতে ভুলে গিয়েছেন। এক্ষণে উক্ত হাজীর করণীয় কি?

-আনোওয়ার হোসাইন, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মক্কায় অবস্থানকালে বিষয়টি জানতে পারলে মক্কায় হাদীর ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কারণ এটা হজ্জে তামাত্তু' ও কেরানকারীর জন্য ওয়াজিব। আর দেশে ফিরে আসার পর জানতে পারলে দশদিন ছিয়াম পালন করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১৮/১৪৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ওমরাহ্‌র সাথে হজ্জ পালন করতে চায়, সে যা সহজলভ্য হয়, তাই কুরবানী করবে। তবে কেউ যদি কুরবানী না পায়, সে হজ্জের দিনগুলির মধ্যে তিনটি এবং বাড়ীতে ফিরে সাতটি ছিয়াম পালন করবে। এভাবে দশটি পূর্ণ হবে *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অতএব যে হাদী (কুরবানীর পশু) না পায়, সে হজ্জের তিন দিন ছিয়াম রাখবে এবং সাত দিন যখন সে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যাবে' *(বুখারী হা/১৬৯১; মিশকাত হা/২৫৫৭)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : হজ্জে কেরান ও তামাত্তু'কারীরা হাদী যবহ করে থাকেন। প্রশ্ন হ'ল, হাদীর গোশত কুরবানীর গোশতের মত করে খেতে পারবে কি?

-আল-আমীন, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জে কেরান ও তামাত্তু'কারীরা তাদের প্রদত্ত হাদীর গোশত নিজেরা খাবে এবং অসহায়দের মাঝে বণ্টন করে দিবে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তদের খাওয়াও' *(হজ্জ ২২/২৮)*। তবে কোন ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে কাফফারা স্বরূপ কোন দম তথা কুরবানী দেওয়া হ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে না। বরং পুরোটাই বণ্টন করে দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৩৮৫)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : জনৈক ব্যক্তি হজ্জ সমাপ্ত করে মদীনা, তায়েফ বা অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করে আবার মক্কায় ফিরতে চান। এক্ষণে বিদায়ী তওয়াফ করে চলে যাবে নাকি ফিরে এসে বিদায়ী তওয়াফ করবে?

-আব্দুর রঊফ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সাময়িক সফর থেকে ফিরে এসেও বিদায়ী তওয়াফ করা যায়। তবে মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বিদায়ী তওয়াফ সম্পন্ন করেই অন্যত্র সফরে বের হওয়া নিরাপদ। কারণ কোন কারণে ফিরে আসতে না পারলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যেন তাওয়াফে বিদা' (বায়তুল্লাহ্‌র শেষ তাওয়াফ) না করে মক্কা থেকে বের না হয়' *(মুসলিম হা/১৩২৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'মানুষকে আদেশ করা হয়েছে যে, তাদের শেষ কাজ যেন কা'বা ঘরের সাথে হয় (অর্থাৎ তাওয়াফ করে বের হয়) *(বুখারী হা/১৭৫৫)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : একজন কুরআনের হাফেয দশজন বা ততোধিক ব্যক্তিকে জান্নাতে নিতে পারবে মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে কি?

-আব্দুল্লাহ মা'রূফ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ ও জাল *(আহমাদ হা/১২৭৭; যঈফুত তারগীব হা/৮৬৮)*। তবে কুরআনের হাফেযদের মর্যাদার ব্যাপারে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন তারা জান্নাতে সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে *(মুসলিম হা/৭৯৮)*। কুরআনের হাফেযকে উজ্জ্বল মুকুট ও জামা পরানো হবে এবং তাদের পিতা-মাতাকে সম্মানের পোষাক পরানো হবে *(ছহীহুত তারগীব হা/১৪৩৪)*। তার যত আয়াত মুখস্থ থাকবে, মর্যাদার স্তর তত উন্নীত হবে *(ছহীহুত তারগীব হা/১৪২৬)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : আমি একাকী আছরের আগে তাহিয়াতুল ওযূ ছালাত পড়ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পায়ে পা মিলিয়ে ফরয মনে করে জামা'আতে শামিল হ'ল। এখন আমি কী করব? তাহিয়াতুল ওযূ শেষ করব, না নিয়ত পাল্টে চার রাক'আত আছরের ফরয পড়ব?

-আখতার হোসাইন, সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : যে নিয়তে ছালাত শুরু করেছে সে নিয়তেই ছালাত সমাপ্ত করে সালাম ফিরাবে। অর্থাৎ তাহিয়াতুল ওযূ'র দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে সালাম ফিরাবে। আর মাসবূক যে আছরের ছালাতের নিয়তে যোগ দিয়েছে, সে ছালাত সম্পন্ন করবে। কারণ ফরয ছালাত আদায়কারী নফল ছালাত আদায়কারীর ইমামতিতে ছালাত আদায় করতে পারে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/৩০৭-৩০৮ ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/২)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : ফরয গোসলের সময় শরীরের কিছু অংশে পানি না পৌঁছালে এবং তা ২ দিন পর নিশ্চিত হ'লে করণীয় কি? গত ২ দিনের ফরয ইবাদত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-আরীফা, নাটোর।

উত্তর : যদি কেউ অপূর্ণ গোসলে ছালাত আদায় করে থাকে, তবে তার ছালাত শুদ্ধ হবে না এবং তাকে গোসল পূর্ণ করার পর পূর্বে আদায়কৃত সব ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ পবিত্রতা (তাহারাৎ) ছালাত ছহীহ হওয়ার শর্ত। আর যে বিষয় ছাড়া ফরয আদায় সম্ভব নয়, তা ফরয হয়ে যায়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যদি কেউ নিজের শরীরের কোন অংশ (ছোট হোক বা বড়) ধৌত করা বাদ দিয়ে দেয় এবং পরে নিশ্চিত হয় যে শরীরের একটি অংশ ধোয়া হয়নি অথচ

সে ঐ অবস্থায় ছালাত আদায় করেছে তাহ'লে তাকে প্রথমে ঐ (শুকনো) অংশ ধুতে হবে, এরপর ঐ গোসল দ্বারা যে ছালাত পড়েছে, তা পুনরায় আদায় করতে হবে *(কিতাবুল উম্ম ১/৫৮)*। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, গোসল বা ওযূর অঙ্গসমূহের কোন অংশে যদি পানি না পৌঁছে, তাহ'লে তা শুদ্ধ হবে না সে অংশ অল্পই হোক বা বেশী *(শরহ মুসলিম, ৩/১৩৫)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ ভুলে গিয়ে কোন অঙ্গ না ধুয়ে থাকে, তাহ'লে গোসল ছহীহ হবে না, যতক্ষণ না তা ধুয়ে ফেলে *(আল-মুগনী ১/১৪৫)*। উল্লেখ্য, ফরয গোসলের সময় জানাবাত থেকে পবিত্রতার নিয়ত করতে হবে। অন্যথায় গোসল সিদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : ৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে আমরা স্বামী-স্ত্রী অনেকবার তালাক চেয়েছি। স্বামীও কয়েকবার জবাবে বলেছে তুমি একেবারে চলে যাও। আর এসো না। জনৈক আলেম বলেছেন, নিয়ত না থাকলে এগুলো ধর্তব্য হবে না। এক্ষণে এর সঠিক সমাধান কি?

-সাবিকুন্নাহার, চাঁদপুর।

উত্তর : উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক। কারণ তালাক প্রদানের জন্য দুই ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয়। (১) স্পষ্টভাবে তালাক শব্দ ব্যবহার করে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত নয়। (২) ইঙ্গিতবহ শব্দ ব্যবহার করা। যেমন তুমি পিতার বাড়ি চলে যাও, তুমি একেবারে চলে যাও, তোমার আর দরকার নেই ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত। তালাকের নিয়ত না করলে তালাক হবে না। কারণ এ কথাগুলো স্বামী-স্ত্রীকে সাধারণভাবে সতর্ক করার জন্যও বলতে পারেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩৯৭; আশ-শারহুল কাবীর ৮/২৭৫ ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/২৯১)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : আমি আমার এক আত্মীয়কে ব্যবসার জন্য দুই লক্ষ টাকা দিয়েছি এবং সে ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে মাসে প্রতি লাখে ৮৫০ টাকা করে দিবে বলে নিয়েছে এবং ৮৫০ টাকা করে দিচ্ছে। উক্ত টাকা নেয়া শরী'আত সম্মত হবে কি? উল্লেখ্য যে, তার ব্যবসাটা হালাল এবং ব্যবসাও চলমান আছে।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গাযীপুর।

উত্তর : নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ গ্রহণ করায় তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে। কারণ ব্যবসা পরিচালিত হয় লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে। এক্ষণে কেউ যদি লভ্যাংশের শতকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নেওয়ার শর্তে টাকা বিনিয়োগ করে এবং আরেকজন ব্যবসা করে তাহ'লে তাতে দোষ নেই। শরী'আতে যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি দু'টি- (১) মুশারাকা : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বিনিয়োগ করবে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসান বণ্টিত হবে *(দারাকুৎনী হা/৩০৭৭)* (২) মুযারাবা : একজনের অর্থে অপরজন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে *(আবূদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : বোনেরা পিতার মূল বসতবাড়ি থেকে কোন অংশ পাবে কি? জমি ভাগ করা গেলেও মূল বাড়ি ভাগ করতে হবে কি?

-হাসীবুর রশীদ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পিতা-মাতার রেখে যাওয়া বসতবাড়িসহ যাবতীয় সম্পত্তিতে ছেলেদের মতই মেয়েরা অংশীদার হবে। তবে মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পাবে *(নিসা ৪/১১)*। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বোনেরা বণ্টনের সুবিধার্থে ও সামাজিকতা রক্ষার্থে ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে পারে এবং ভিটা বা বসতবাড়ির ভাগ ছেড়ে দিয়ে এর বিপরীতে অন্যত্র ভাগ নিতে পারে।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : ঈদগাহের সামনের দিকে সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার একটি প্রাচীর আছে এবং প্রাচীরের মাঝামাঝিতে একটি মেহরাব বানানো আছে। এভাবে ঈদগাহে স্থায়ী মেহরাব বানিয়ে রাখা জায়েয হবে কি?

-শামীম আখতার, ভারত।

উত্তর : ঈদের ছালাতের জন্য মেহরাব নির্মাণ করা উচিৎ নয়। বরং সুন্নাত হ'ল ঈদের ছালাত খোলা জায়গায় (মাঠে বা ঈদগাহে) আদায় করা, মসজিদে নয়। ঈদের ছালাত খোলা মাঠে আদায় করা সুন্নাত। কেবল মক্কার লোকেরা হারামে পড়তে পারে *(আল-মাজমূ' ৫/৪)*। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, 'ঈদের ছালাত ময়দানে পড়া সুন্নাত, কেননা নবী করীম (ছাঃ) সব সময় ময়দানে পড়েছেন। তিনি একবার ব্যতীত কখনো মসজিদে ঈদের ছালাত পড়েননি। সেবার তিনি বৃষ্টির কারণে মসজিদে পড়েছিলেন *(ইবনু কুদামা, মুগনী ২/২৭৫-৭৬)*। অতএব ঈদের মাঠে মেহরাব বানানো থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : জনৈকা মহিলা রাগের মাথায় কাযী অফিসে গিয়ে স্বামীকে ডিভোর্স দেয় তথা খোলা' করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে স্বামীর নিকট ফেরত যেতে চায়। এক্ষণে ইদ্দত পালন না করেই প্রথম স্বামীর সাথে সংসার করতে পারবে কি?

-মুখতার আযহার, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ যা নারীর পক্ষ থেকে হয় স্বামী থেকে মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফেরৎ দেওয়ার মাধ্যমে। সেজন্য এখানে রাজ'আতের কোন ব্যবস্থা নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১৮১; শাওকানী, নায়লুল আওতার ৬/২৯৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৬৭-৭০)*। এক্ষণে যদি তারা আবার সংসার করতে চায় তাহ'লে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করতে হবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১২৭; তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৬২০)*। তবে যদি উক্ত মহিলা স্বামী ব্যতীত অন্যত্র বিবাহ করতে চায় তাহ'লে অবশ্যই তাকে এক হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৯/৩৪৬)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই এমন হয় যে, শিক্ষকেরা বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট দিয়ে থাকেন, যা শিক্ষার্থীদের নিজেদের করার কথা। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে প্রজেক্ট করায় বা টাকার বিনিময়ে প্রজেক্ট কিনে নেয়। আর কেউ এ অবৈধ কাজে সহযোগিতা করে। এসব ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

-রাফাত আনাম, ঢাকা।

উত্তর : এটা বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি

প্রতারণা, যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এতে যারা সহযোগিতা করে তারাও পাপী হবে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করার জন্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : গর্ভবতী নারী যে কাজগুলো বেশী বেশী করবে, তার প্রভাব কি তার গর্ভের সন্তানের উপর পড়বে? যেমন বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত, দো'আ পাঠ করা, নেক আমল করা ইত্যাদি।

-নাজমুল, শেরপুর।

উত্তর : ছহীহ হাদীছে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে কুরআন-সুন্নাহর সাধারণ নীতিমালার আলোকে এবং সালাফদের বক্তব্যে অনুরূপ কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, অতঃপর তিনি তাকে সুগঠিত করলেন এবং তার মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিলেন। তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর *(সাজদাহ ৩২/৯)*। এখান থেকে বুঝা যায়, রূহ ফুঁকে দেওয়ার পরেই আল্লাহ মানুষকে দান করেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় বা অন্তর। আর মানব দেহে রূহ ফুঁকা হয় ১২০ দিন বয়সে। অর্থাৎ এরপর থেকে মা যা করে গর্ভস্থ শিশু তা দেখে, শুনে এবং অনুধাবন করে *(The Cambridge Encyclopedia of Child Development, অধ্যায় "Prenatal sensory development, পৃ. ৪০০-৪১০)*। অতএব যদি মা গর্ভাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত, যিকর, ছালাত ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যে লিপ্ত থাকেন, তবে এর প্রভাব গর্ভস্থ সন্তানের ওপর পড়বে বলে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ। সেজন্য এসময় মায়ের আমল সুন্দর ও শরী'আত সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে অনেক ফযীলতের কথা হাদীছে বলা হয়েছে। আমরা দেখি যে, ডাক্তারের কাছে রোগী আসে চিকিৎসার জন্য। এক্ষেত্রে ডাক্তার যদি সৎ নিয়ত রাখে তাহ'লে হাদীছে বর্ণিত ফযীলত পাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ডাক্তাররা যদি পেশাগত কাজের পাশাপাশি রোগীর সেবা ও দেখাশোনায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও মুসলিম ভাই-বোনের উপকার সাধনের নিয়ত রাখেন, তাহ'লে তারা হাদীছে বর্ণিত মর্যাদা লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। শায়খ ওমর সুলায়মান আশকার বলেন, 'যারা দুনিয়াবী কাজে নিয়োজিত, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক তাঁরা যদি সৎ নিয়ত করে কাজ করেন, তাহ'লে তা ইবাদতে পরিণত হয়; আর এজন্য তাঁদের দুনিয়াবী লাভের ইচ্ছা ত্যাগ করাও যরূরী নয়' *(মাকাছিদুল মুকাল্লিফীন পৃ. ৪০০)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে থাকা মেয়ের অভিভাবকের সম্মতিতে অথবা অভিভাবক ছাড়াই বিবাহ পড়ানো যাবে কি?

-আব্দুল মালেক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের শর্তসমূহ উপস্থিত থাকলে এবং অভিভাবকের সম্মতি থাকলে উক্ত বিবাহ পড়ানো জায়েয। আর অভিভাবকের সম্মতি না থাকলে সে বিবাহ পড়ানো যাবে না। কারণ প্রথমত অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত যে বিবাহ হয়, সেটা বাতিল *(আবূদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১, সনদ ছহীহ)*। দ্বিতীয়ত বিবাহে সহযোগিতা ছওয়াবের কাজ হ'লেও অভিভাবকের অনুমতিহীন বিবাহ পড়ানো গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর, যা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : আমি ১০ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়েছিলাম। সেটা সূদ সহ ১৬ লক্ষ টাকা হয়েছে। বর্তমানে ১০ লক্ষ টাকার অধিক পরিশোধ করেছি কিন্তু সূদের টাকা এখনো কিছু বাকি আছে। এক্ষণে আমার প্রশ্ন-আমাকে কি এই অতিরিক্ত সূদের টাকাটা পরিশোধ করতে হবে এবং এটা পরিশোধ না করে মারা গেলে গুনাহগার হ'তে হবে?

-মেছবাহুদ্দীন, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা।

উত্তর : সূদে লেনদেন শুরু করাই গুনাহের কাজ। এজন্য সূদী লেনদেন শুরু করায় ব্যক্তিকে অনুতপ্ত হয়ে তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২৪০; ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাকা ৫/২১০)*। দ্বিতীয়ত মূল অর্থের অতিরিক্ত যে সূদ হয়েছে, তা না প্রদান করলে শারঈ দৃষ্টিতে ঋণী হিসাবে গুনাহগার হবে না। অতএব যদি প্রদান না করার সুযোগ থাকে, তবে প্রদান করবে না।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : গর্ভবতী গরু কুরবানী করার ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?

-রাজেশ সরকার, কুচবিহার, ভারত।

উত্তর : কুরবানীর পশু নির্বাচন করার সময় গর্ভবতী পশুকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। তবে পশু কেনার পর যদি গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায় তাহ'লে উক্ত পশু দিয়েই কুরবানী দিবে। কারণ গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী দেওয়া জায়েয। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী দেওয়া বৈধ। যদি গর্ভের বাচ্চা মৃত অবস্থায় বের হয়, তাহ'লে তার যবহ মায়ের যবহ হিসাবে গণ্য হবে...আর যদি বাচ্চাটি জীবিত অবস্থায় বের হয়, তবে তাকে পৃথকভাবে যবহ করতে হবে' *(আবূদাঊদ হা/২৮২৮; মিশকাত হা/৪০৯১; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৭)*। জমহূর ফক্বীহদের মতে, পশুর গর্ভবতী হওয়া কুরবানীর জন্য অযোগ্য হওয়ার কারণ নয়। তবে শাফেঈ মাযহাবের বিদ্বানগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা মনে করেন যে, গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ হবে না। কারণ গর্ভধারণ পশুর পেটে ভিন্নতা নিয়ে আসে এবং মাংসকে বিস্বাদ করে তোলে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৬/২৮১)*।

উল্লেখ্য যে, কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই তার মায়ের সাথে কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে উক্ত জীবিত বাচ্চা মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে এবং দুধ

বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দিবে *(মির'আত ৫/১১৭-১৮; দ্র. 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : আমি একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করি যেখানে মাছ, গরু ও শূকরের গোশত প্রসেস করে প্যাকেটজাত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে শূকরের গোশত প্যাকেট করতে হয়। এটা জায়েয হবে কি?

-রিপন খান, জাপান।

উত্তর : শূকরের গোশত ক্রয়-বিক্রয় বা প্যাকেটজাত করা নাজায়েয। তা মুসলমানদের জন্য করা হৌক বা কাফেরদের জন্য হোক। কারণ এতে পাপের কাজে সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। আল্লাহ বলেন, 'বল (হে মুহাম্মাদ)! আমি যা অহি দ্বারা পেয়েছি, তাতে আমি কোন বস্তু হারাম পাই না যা ভক্ষণকারী খাবে। কিন্তু হারাম হ'ল; মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশত। কেননা তা নোংরা বা অপবিত্র' *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

শূকরের গোশত কেবল ভক্ষণই নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ একে অপবিত্র বলেছেন, যার উপর ভিত্তি করে এর বেচাকেনাও নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যখন কোন বস্তু হারাম করেন, তখন তিনি তার মূল্যও হারাম করেন' *(আহমাদ হা/২৬৭৮, সনদ ছহীহ)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'মৃত পশু, মদ ও শূকরের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে এই বিষয়ে ইজমা (সর্বসম্মত মত) রয়েছে যে, এগুলোর প্রত্যেকটির বিক্রয় হারাম' *(শরহ মুসলিম ১১/০৮)*। অতএব রিযিক অন্বেষণের বিকল্প পথ খুঁজে নিতে হবে।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : ঈদুল আযহার দিনে পৃথকভাবে ছাগল কুরবানী দিয়ে সন্তানের আক্বীক্বা করা যাবে কি?

-মাহবুব আলম, আমতলী, বরগুনা।

উত্তর : ঈদুল আযহার দিনে কেবল কুরবানী করাই শরী'আত সম্মত; আক্বীক্বা নয়। কেননা আক্বীক্বার একটি নির্ধারিত সময় আছে, তাহ'ল সপ্তম দিনে। যদি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত দিনে আক্বীক্বা না করতে পারে, তবে তার জন্য আক্বীক্বার সময় পার হয়ে গেছে। এখন কেউ যদি ঈদুল আযহার দিনে আক্বীক্বা করতে চায় তাহ'লে সে দু'টি ভুল করবে। প্রথমত এতে এমন এক সময়ে আক্বীক্বা করা হবে, যা শরী'আত বৈধ করেনি। দ্বিতীয়ত সে কুরবানীর দিনের মূল কর্তব্য (কুরবানী) ছেড়ে গৌণ কাজ (আক্বীক্বা) বেছে নিচ্ছে। নবী করীম (ছাঃ) কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে অথচ কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের ধারে কাছেও না আসে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৯০)*। অতএব যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, বরং আক্বীক্বা করে সে শরী'আতের দু'টি বিধান লঙ্ঘন করছে। তবে যদি সন্তান জন্মের সপ্তম দিন ঈদের দিন পড়ে যায় তাহ'লে সে দিন আক্বীক্বা করাতে দোষ নেই। বরং ঈদের দিনেই কুরবানী ও আক্বীক্বা করবে *(আলবানী, ফৎওয়া 'আবরাল হাতেফ, টেপ নং ১৩৩; দ্র. 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : আমি কোন মাহরাম ব্যতীত একাকী বরিশাল থেকে অফিসিয়াল ট্যুরে কক্সবাজার যাচ্ছি। তবে কক্সবাজারে আমার চাচা থাকেন। এভাবে যাওয়া জায়েয হবে কি?

-হালীমা, বরিশাল।

উত্তর : নারীদের একাকী সফরের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আর কোন নারী মাহরাম ছাড়া সফরে বের হবে না। এরপর একজন ছাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়েছেন, আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নাম লিখিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো *(মুসলিম হা/১৩৪১)*। তিনি আরো বলেন, 'কোন নারী যেন নিকটাত্মীয় মাহরাম পুরুষ ছাড়া একদিন ও একরাতের দূরত্বে যাত্রা না করে *(তিরমিযী হা/১১৭০, সনদ ছহীহ)*। আরেকটি হাদীছে এসেছে, 'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া এক দিনের সফরে বের হবে' *(বুখারী হা/১০৮৮)*। তবে রাস্তায় পূর্ণ নিরাপত্তা, সাথে অন্যান্য নারীরা থাকলে এবং অল্প সময়ের সফর হলে যাওয়া যাবে। ইমাম হাত্তাব রু'আনী বলেন, যদি কোন মহিলা এমন একটি নিরাপদ কাফেলায় থাকে, যাতে পর্যাপ্ত লোকবল ও সরঞ্জাম থাকে অথবা এমন একটি নিরাপদ বাহিনীর সাথে থাকে, যা প্রতিপক্ষের উপর বিজয় লাভে সক্ষম, অথবা কোন বৃহৎ ও নিরাপদ এলাকায় অবস্থান করে তাহ'লে তার কোন মাহরাম (পুরুষ অভিভাবক) ছাড়া সফর করার বৈধতা রয়েছে। এই বৈধতা সমস্ত ধরনের সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হোক তা ফরয, নফল বা মুবাহ। এটাই ইমাম মালেক ও অন্যান্যদের মত, কারণ এর মধ্যে এবং নিজ শহরে অবস্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই *(মাওয়াহিবুল জালীল ফি শরহে মুখতাছারে খলীল ২/৫২৪)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : সাধারণ ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংক সবস্থানেই টাকা-পয়সা লেনদেন করার ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয়। এটা সূদের অন্তর্ভুক্ত কি?

-রাক্বীবুল ইসলাম, টাঙ্গাইল।

উত্তর : না। বরং এটা লেনদেনের জন্য সার্ভিস চার্জ মাত্র। অতএব লেনদেনের উদ্দেশ্যে এসব মাধ্যম ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : আমরা একটি পিলার কারখানায় কাজ করি এবং নিয়মিত ছালাত আদায়ের চেষ্টা করি। তবে মসজিদ দূরে এবং কাজের ধরন (কন্ট্রাক্ট ও সময়মতো ছুটি না পাওয়া) এর জন্য আযান শুনলেও মসজিদে যাওয়া সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কারখানায় একাকী বা জামা'আত করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুস সালাম, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : সাধ্যমত মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যতটুকু তোমাদের সামর্থ্য হয় *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি যখন তোমাদের কোন

কিছুর আদেশ দিই, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর *(বুখারী হা/৭২৮৮; মিশকাত হা/২৫০৫)*। তবে মসজিদে যাওয়া সম্ভব না হ'লে কোম্পানীর কোন একটি নির্ধারিত স্থানে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। সেটাও সম্ভব না হ'লে সময়মত একাকী ছালাত আদায় করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২০২-২০৩)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : বিবাহের পর স্ত্রীকে হজ্জ পালন করানোকে বিবাহের মোহরানা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে কি?

-যয়নব, ঢাকা।

উত্তর : যাবে। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের সূরা শিক্ষা দানকেও বিবাহের মোহরানা হিসাবে গণ্য করেছেন *(বুখারী হা/৫০২৯; মুসলিম হা/১৪২৫; মিশকাত হা/৩২০২)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : কোন কাজের ক্ষেত্রে যদি বিনিয়োগকারী এভাবে চুক্তি করেন যে বাস্তবায়নকারী যদি ১ বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে তবে তিনি মোট লাভের অর্ধেক পাবেন। কিন্তু ১ বছর পার হয়ে গেলে ৩ ভাগের ১ ভাগ পাবেন। আর ৫ বছর পার হ'লে কোন লভ্যাংশ পাবেন না। এরূপ চুক্তি জায়েয হবে কি?

-আহমাদ, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তর : এমন চুক্তি, যেখানে প্রকল্প শেষ করার সময় অনুযায়ী লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ধারিত হয় (যেমন এক বছরে অর্ধেক, দুই বছরে এক-তৃতীয়াংশ, পাঁচ বছর পরে কিছুই না) তা শরী'আতে বৈধ নয়। কারণ এতে অনিশ্চয়তা ও অনির্ধারিত শর্ত রয়েছে, যা মুশারাকা বা মুযারাবার চুক্তিকে বাতিল করে দেয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৫/২৩-২৪)*। তবে বিকল্প হিসাবে যদি শুরুতেই উভয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট লাভ ভাগের চুক্তি করা হয় (যেমন- ৫০/৫০ বা ৪০/৬০)। আর যদি পারফরম্যান্স ভালো হয়, তাহ'লে বোনাস বা ইনসেনটিভ দেওয়া যেতে পারে এবং এটি পৃথক চুক্তিতে হ'তে পারে। তাছাড়া কাজ সময়মতো শেষ না হ'লে জরিমানা বা পারফরম্যান্স ফী কেটে রাখা যায়, তবে সেটা লাভের ভাগের পরিবর্তে নয়।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : আমাদের মসজিদে খুৎবায় তেমন কোন উপকারী আলোচনা হয় না। সেক্ষেত্রে বাসায় মোবাইলে যোগ্য আলেমদের খুৎবা শুনে ছালাত শুরু হওয়ার আগে গিয়ে জুম'আ আদায় করা যাবে কি?

-আনীস, তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এটা করা যাবে না। কারণ মুসজিদে গিয়ে খুৎবা শ্রবণ করায় নেকী আছে। কিন্তু বাড়ীতে মোবাইলে খুৎবা শ্রবণ করায় জামা'আতের নেকী নেই। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল করে সুগন্ধি মেখে সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে নফল ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত করবে। যেমন দুই দুই রাক'আত করে নফল ছালাত আদায় করা, দো'আ-ইস্তিগফার পাঠ করা, কুরআন তেলাওয়াতসহ অন্যান্য যিকিরে নিয়োজিত থাকা কর্তব্য। এই নিয়ম মেনে মসজিদে গেলে উট, গরু বা ছাগল কুরবানী করার ছওয়াব লাভ করবে *(বুখারী হা/৮৮১; মুসলিম হা/৮৫০)*। ইমাম যখন খুৎবায় দাঁড়িয়ে যাবেন, তখন মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শ্রবণ করবে। আর যোগ্য আলেমদের বক্তব্য যেকোন সময় শ্রবণের সুযোগ রয়েছে। অতএব জুম'আর দিনে মসজিদে যেতে বিলম্ব করবে না বরং যত দ্রুত সম্ভব মসজিদে চলে যাবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/২৪৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : ডাক্তারদের জন্য বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ঔষধের স্যাম্পল ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী গ্রহণ করা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-ডা. মাহবুব হাসান, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ঔষধের প্রচারের জন্য স্যাম্পল প্রদানে এবং গ্রহণে কোন দোষ নেই। কারণ ঔষধ প্রচারের জন্য এটা প্রয়োজন। কিন্তু স্যাম্পল ব্যতীত উপহারের নামে বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদান করা এবং গ্রহণ করা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে উপহার প্রদানকারী কোম্পানীর ঔষধ রোগীদেরকে লিখে দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতেই উক্ত উপহার প্রদান করা হয়ে থাকে, যা ঘুষ হিসাবে গণ্য *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ২৩/৫৭০)*। ফাতাওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, চিকিৎসকের জন্য ওষুধ কোম্পানীর পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণ করা বৈধ নয়; কারণ এটি ঘুষের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সেটিকে 'উপহার' বা অন্য কোন নাম দেওয়া হোক না কেন। নাম পরিবর্তন করলে বাস্তবতার পরিবর্তন হয় না এবং এই উপহার গ্রহণের ফলে ডাক্তার ঐ কোম্পানীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন, যা অন্যান্য কোম্পানীর প্রতি অবিচার এবং ক্ষতিকর *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৩/৫৭১)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে কোম্পানীর প্রতিনিধি ডাক্তারদেরকে নিজ কোম্পানীর ওষুধ প্রচারের উদ্দেশ্যে উপহার দেয়, অন্য কোম্পানীগুলোর তুলনায় একচেটিয়াভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে, সে ব্যক্তি রায়িশ (ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার মাঝে মধ্যস্থতাকারী) হিসাবে গণ্য হবে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ তিন শ্রেণীর মানুষকে অভিশাপ দিয়েছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৩/৫৭২)*। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা এবং উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন' *(আহমাদ হা/২২৩৯৯)*। যদিও এই হাদীছে 'রায়িশ বা উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারী' অংশটি দুর্বল, তবে মর্ম ছহীহ।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : বর্তমানে এআই টেকনোলজি দিয়ে বিভিন্ন বক্তার ভিডিও বক্তব্য নকল করে নিজের মত কথা সাজিয়ে বলানো সম্ভব হচ্ছে। ফলে যিনি যা বলেননি, কৃত্রিমভাবে তাই বলানো যাচ্ছে। যাতে বিভ্রান্তি ছড়ানোর ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে বক্তব্য নকল করা জায়েয হবে কি?

-আল-আমীন, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : জনকল্যাণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করায় দোষ নেই। কিন্তু এআই প্রযুক্তি দিয়ে কোন আলেম, বক্তা বা সম্মানিত ব্যক্তি যিনি তা বলেননি তার কণ্ঠস্বর বা চেহারা নকল করে মিথ্যা বক্তব্য বানানো এবং তা ছড়ানো হারাম। কেননা এর মধ্যে রয়েছে ধোঁকা, মিথ্যাচার ও চরম বিভ্রান্তি। ইসলামী শরী'আতে এর কোনরূপ অনুমোদন নেই।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : আমাদের এলাকায় লাশ বহনের খাটে কালো কাপড় দেওয়া হয়, যাতে আয়াতুল কুরসী লেখা থাকে। এটা শরী'আত সম্মত কি?

-আব্দুর রশীদ, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : লাশের খাটে আয়াতুল কুরসী লিখলে এতে মৃতব্যক্তির কোন উপকারে আসার প্রশ্নই আসে না। এগুলি মনগড়া ও বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : যুবতী নারীরা পূর্ণ পর্দার সাথে সুন্দর ও মার্জিত কালারের বোরক্বা ও নেকাব পরিধান করে বাইরে চলাফেরা করতে পারবে কি? এছাড়া পর্দায় থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের ছবি বা ভিডিও শেয়ার করতে পারবে কি?

-মুরাদ, টাঙ্গাইল।

উত্তর : প্রথমত শারঈ পর্দার বিধান মেনে সুন্দর ও মার্জিত কালারের বোরক্বা ও নেক্বাব পরিধান করে প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে। তবে অবশ্যই তা ঢিলেঢালা হ'তে হবে *(আহযাব ২৪/৫৯)*। এছাড়াও আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা (নারীরা) নিজেদের গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্ব জাহিলিয়াতের মতো প্রকাশ্যে সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না *(আহযাব ২৪/৩৩)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন দেশে নারীদের মধ্যে সাদা কাপড় পরা প্রচলিত থাকে, তাহ'লে নারীর জন্য সাদা কাপড় পরায় কোন দোষ নেই। তবে শর্ত হ'ল, সেটা যেন পুরুষদের কাপড়ের মতো না হয়। রঙ নিজে গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং শর্ত হ'ল নারীর কাপড় যেন পুরুষের কাপড় থেকে পৃথক হয়। কিন্তু যদি কোন দেশের প্রথায় নারীরা সাধারণত কালো, সবুজ বা লাল কাপড় পরে এবং সাদা পরা তাদের মধ্যে বিরল হয় বা চোখে পড়ার মতো কিছু হয়, তাহ'লে তাদের উচিত নিজেদের দেশের প্রচলিত পোষাকই পরিধান করা এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত রাখা *(আল-লিক্বাউশ শাহরী ৬৬/২৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, নারীর জন্য যেকোন কাপড় পরা জায়েয, যতক্ষণ না সেটা 'তাবাররুজ' বা সৌন্দর্য-প্রদর্শনের পর্যায়ে পড়ে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে- কাপড়ের রঙ নয়, বরং যা ফিতনার কারণ হয় বা মানুষ যেটাকে সৌন্দর্যরূপে দেখে, তা এড়িয়ে চলতে হবে। আর সামাজিক মাধ্যমে নারীদের কোন প্রকারের ছবি প্রকাশ করা জায়েয নয়। কারণ এটি ফিৎনার কারণ।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : স্ত্রীকে তার নিজস্ব উপার্জন পরিবারে ব্যয় করতে বাধ্য করা যাবে কি?

-ইসমাঈল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : নারী তার উপার্জনের মালিক। আল্লাহ বলেন, 'নারী যা উপার্জন করে, সেটা তার অংশ' *(নিসা ৪/৩২)*। স্বামী বা পরিবার তাকে সেটা খরচ করতে বাধ্য করতে পারবে না। তবে পারিবারিক ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহনশীলতা রক্ষা করে যদি স্ত্রী নিজ ইচ্ছায় সহযোগিতা করেন, তাহ'লে তা হবে ছওয়াবের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষরা নারীদের অভিভাবক... কারণ তারা তাদের উপর খরচ করে' *(নিসা ৪/৩৪)*। তিনি আরো বলেন, 'স্ত্রীদের জন্য তোমাদের উপর কর্তব্য হ'ল, তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা শরী'আত সঙ্গতভাবে' *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, একজন মানুষের জন্য তার স্ত্রী ও সন্তানদের উপর শারঈ মতে খরচ করা আবশ্যক। চাই স্ত্রী ধনী হৌক বা গরীব। এমনকি যদি স্ত্রী উপার্জনক্ষম হন এবং তিনি শিক্ষকতা করেন, আর বিয়ের সময় শর্ত করা হয় যে, স্বামী তাকে এই চাকরীতে বাঁধা দিবেন না এবং স্বামী তা মেনে নেন, তাহ'লে স্বামীর কোন অধিকার নেই যে তিনি স্ত্রীর উপার্জন (বেতন) থেকে কিছু দাবী করবেন। না অর্ধেক, না এক-চতুর্থাংশ কিছুই না। কারণ বেতনের উপার্জিত অর্থ তো স্ত্রীর নিজস্ব মালিকানাধীন। কিন্তু যদি বিবাহের সময় এই শর্ত না থাকে যে, স্ত্রীকে চাকরী করতে দেওয়া হবে। তাহ'লে বিয়ের পর স্বামী চাইলে স্ত্রীকে বলতে পারেন, তুমি যদি চাকরী করতে চাও, তাহ'লে আমাকে এই পরিমাণ দিতে হবে, অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। এটি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিতে হ'তে পারে' *(শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৬/১৪৩-১৪৪)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : জাতীয় সংগীত বা পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মাথা নিচু করা, নীরবতা পালন করা ইত্যাদির ব্যাপারে শারঈ নির্দেশনা কি?

-হাবীবুল্লাহ, মাগুরা।

উত্তর : জাতীয় সংগীত বা পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে মাথা নীচু করা, নীরবতা পালন করা বা সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম। ফৎওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে- কোন জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের দাঁড়িয়ে যাওয়া বৈধ নয়। বরং এটি একটি নিকৃষ্ট বিদ'আত, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও ছিল না। এটি তাওহীদ বিরোধী এবং একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত শ্রদ্ধার (ইখলাছের) পরিপন্থী। এমন কর্ম শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম এবং এতে কাফেরদের সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের অগ্রহণযোগ্য রীতি-আচার ও বাড়াবাড়ির অনুসরণ রয়েছে। তারা তাদের নেতাদের এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাবলীকে যেভাবে অত্যধিক গৌরবান্বিত করে, এটি তেমনই। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাফেরদের অনুকরণ করতে বা তাদের মতো হওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/২৩৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : শখের বশে বিড়াল বা কুকুর পোষা যাবে কি?

-মেহেদী কবীর, কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বিড়াল পোষা শরী'আতে বৈধ ও জায়েয, যতক্ষণ না তাতে কষ্ট দেওয়া হয় বা অন্য কোন হারাম কাজ ঘটে। ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) সহ একাধিক ছাহাবী বিড়াল পুষতেন। আর রাসূল (ছাঃ) একে গৃহ প্রদক্ষিণকারী হিসাবে গণ্য করেছেন *(আবূদাউদ হা/৭৫; মিশকাত হা/৪৮২, সনদ ছহীহ)*। তবে শখের বশে বা সঙ্গী হিসাবে কুকুর পোষা হারাম ও গোনাহের কাজ। কেবল তিনটি কারণে কুকুর পোষা যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি শিকার, পশু পাহারা বা কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কারণে কুকুর পোষে, তার প্রতিদিন এক ক্বীরাত পরিমাণ ছওয়াব কমে যায়' *(মুসলিম হা/১৫৭৪; নাসাঈ হা/৪২৮৭)*। তিনি আরো বলেন, 'সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যেখানে কুকুর বা প্রাণীর ছবি থাকে *(বুখারী হা/৩৩২২; মিশকাত হা/৪৪৮৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : ই-কমার্সের মাধ্যমে অর্ডার নিয়ে পরে পণ্য সংগ্রহ করে ডেলিভারি দেওয়া বাই'য়ে সালাম এর আওতায় পড়বে কি? এটা জায়েয হবে কি?

-যহূরুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : কয়েকটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তা বাই'য়ে সালাম এর আওতায় পড়বে। ১. মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। অর্ডারের সময় সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক। পরবর্তী সময়ে কিস্তিতে দেওয়া হ'লে এটি সালাম হবে না। অথবা পণ্য হাতে পাওয়ার সাথে সাথে মূল্য পরিশোধ করতে হবে, যাকে বাই'য়ে সালাম হাল বলে। ২. পণ্যের ধরন, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত থাকতে হবে। ৩. সরবরাহের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ থাকতে হবে। ৪. বাজারে সেই পণ্য বিদ্যমান থাকতে হবে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই হাদীছে সালাম (আগাম ক্রয়)-এর ক্ষেত্রে মোটেই তাৎক্ষণিক সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়নি, বরং নিষেধ করা হয়েছে এমন এক বিক্রয় পদ্ধতি থেকে, যেখানে একজন এমন কিছু বিক্রি করে যা এখনো তার মালিকানায় নেই এবং যার সরবরাহ দেওয়ার সক্ষমতাও তার নেই; অথচ সে তা আগেই বিক্রি করে দেয় এবং লাভও করে নেয়, তখন সেটা তার জন্য নাজায়েয।

তাই যদি কেউ তাৎক্ষণিক অগ্রিম বিক্রয় করে অথচ তার কাছে পণ্যটি নেই এবং সে নিজে তা সরবরাহ করতেও সক্ষম নয়, তখন সে এমন কিছুর দায় নিচ্ছে যা হয়তো পাবে কিংবা পাবে না। এটা এক প্রকার প্রতারণা (غرر) এবং ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন (مخاطرة)। কিন্তু যদি বাস্তবে পণ্যটি তার কাছে থাকে এবং সে তাৎক্ষণিক সরবরাহে সক্ষম হয়। তাহ'লে এটি জায়েয হবে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যখন বিলম্ব বাই'য়ে সালাম বৈধ, তখন তাৎক্ষণিক বাই'য়ে সালাম আরও বেশী বৈধ হওয়া উচিত *(যাদুল মা'আদ ৫/৭২০)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন মাসআলায় বা মতাদর্শে মতপার্থক্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখতে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ইসলামের নির্দেশনা কী?

-জসীম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে মৌলিক আক্বীদা ও ইসলামবিরোধী মত (যেমন: কুফর, বিদ'আত, গোমরাহী) না হ'লে শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে পারস্পরিক সহনশীলতা প্রদর্শন করবে। আর আক্বীদা বিরোধী হ'লে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান এবং হিকমতের সাথে প্রতিরোধ করতে হবে। আর ছোটখাটো অপ্রধান ইখতিলাফ বা ব্যক্তিগত অভিমতে মতপার্থক্য দেখা দিলে তা উপেক্ষা করা এবং ঐক্য অটুট রাখা কর্তব্য। ছাহাবীগণ নিজেদের মধ্যেই বহু ফিক্বহী বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তবুও কেউ কাউকে বিদ'আতী, গোমরাহ বা বাতিল বলে আক্রমণ করেননি। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) সাহরীর শেষ সময় ও ইফতারের সময় নিয়ে পরস্পর বিরোধী ছিলেন *(মুসলিম হা/১০৯৯)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) কুনুত পড়তেন না, আলী (রাঃ) পড়তেন তবুও কেউ কাউকে বাতিল বলেননি। উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য রক্ষায় করণীয় হ'ল- ১. ছহীহ হাদীছের আলোকে মতভেদ দূর করা। ২. মাসআলাগত মতবিরোধকে সামাজিক বিভাজনের কারণ না বানানো। ৩. হিকমত, দয়া ও নম্রতার সাথে মতপ্রকাশ করা। ৪. 'আমি ঠিক, তুমি ভুল' এরূপ মনোভাব পরিহার করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করা। ৫. একমত না হ'লেও ভালোবাসা ও দো'আ বজায় রাখা।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : আমার মা আমার স্বামীকে অপসন্দ করে, গালি দেয় এবং বদ দো'আ করে। এক্ষণে আমি যদি স্বামীকে অগ্রাধিকার দিয়ে মাকে এড়িয়ে চলি তবে আমি গোনাহগার হব কি?

-আনিকা, বগুড়া।

উত্তর : এ অবস্থায় মাকে এড়িয়ে চললে গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে সুন্দরভাবে মাকে স্বামীর প্রতি ইতিবাচক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবে এবং স্বামীকেও বুঝানোর চেষ্টা করবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'স্বামীর আনুগত্য করা তার (স্ত্রীর) জন্য মায়ের আনুগত্যের চেয়ে অধিক আবশ্যক, যদি না স্বামী তাকে (মায়ের কথা মানার বিষয়ে) অনুমতি দেন' *(শরহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৪৭)*। ইমাম মারদাভী বলেন, 'স্ত্রীর জন্য স্বামীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে কিংবা স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র (যেমন পিতামাতার বাসায়) ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আদেশ মানা ওয়াজিব নয়। বরং স্বামীর আনুগত্যই তার জন্য অধিক যরূরী *(আল-ইনছাফ ৮/৩৬২)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যে সকল আনুগত্য এক সময় পিতা-মাতার প্রতি আবশ্যক ছিল, বিবাহের পর তা স্বামীর প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যায়। বিবাহের পর স্ত্রীর উপর পিতা-মাতার আনুগত্য অপরিহার্য থাকে না। পিতা-মাতার হক ছিল রক্তের সম্পর্কের কারণে, আর স্বামীর হক এসেছে চুক্তি (নিকাহ) ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬০-২৬১)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন থ্যালাসেমিয়া, এইডস ইত্যাদি যেগুলোর কোন চিকিৎসা নেই, সেসব রোগে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে পরকালে বিশেষ কোন মর্যাদায় ভূষিত হবে কি?

-মিশকাত মাশফী, চকমামারোজপুর, গাইবান্ধা।

উত্তর : থ্যালাসেমিয়া, এইডস ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা শহীদের মর্যাদা পাবেন কিনা এ মর্মে হাদীছে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি যদি ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে তার গুনাহ মাফ হয়, সে বিশেষ মর্যাদা পায় এবং জান্নাত তার জন্য সহজ হয়ে যায় *(বুখারী হা/৫৬৪১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শহীদ পাঁচ ধরনের—যিনি মহামারীতে মারা যান, যিনি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করেন, যিনি পানিতে ডুবে মারা যান, যিনি বাড়ি ধ্বংস হয়ে মারা যান এবং যিনি আল্লাহ্র পথে শহীদ হন *(বুখারী হা/৬৫৩; মিশকাত হা/১৫৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : অমুসলিম দেশে যেখানে মসজিদ সহজলভ্য

নয়, যেখানে মসজিদ পাওয়ার জন্য ২-৩ ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে মোটা অংকের খরচ করতে হয়, সেখানে জুম'আর বিধান কি? সেক্ষেত্রে বাড়িতে একাকী বা সন্তানদের নিয়ে ৩-৪ জনে জুম'আ আদায় করা যাবে কি? নাকি যোহর আদায় করতে হবে?

-সাজিদুল ইসলাম, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় যোহরের ছালাত আদায় করবে। শায়েখ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ দেশের বাইরে থাকে এবং তার মসজিদ থেকে দূরত্ব তিন মাইলের বেশী হয়, তবে তার ওপর জুম'আর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা ফরয নয়' *(আশ-শারহুল মুমতে' ৫/১৫)*। তিনি আরো বলেন, জুম'আর ছালাত বন-জঙ্গল বা নির্জন স্থানে আদায় করা যায় না, চাই মানুষ ভ্রমণরত থাকুক বা স্বীয় আবাসস্থলে থাকুক। বিদ্বানগণ বলেন, রাসূল (ছাঃ) এর যুগে যেসব পল্লী বা এলাকা নির্জন ছিল, সেখানে জুম'আ আদায় করা হ'ত না। বরং জুম'আ আদায় করা হ'ত জনবসতিপূর্ণ গ্রাম ও নগরীগুলোতে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৬৯)*। তবে সাধ্যমত জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করবে। অন্তত প্রতি তিন জুম'আ পরপর হ'লেও মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করবে *(আবূদাঊদ হা/১০৫২; মিশকাত হা/১৩৭১)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : আমি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরী করি। অফিসের বিভিন্ন মেশিন ঠিক করার দরপত্র আসে বিভিন্ন কোম্পানী থেকে। আমি এই দরদাম সম্পর্কিত তথ্য একজন ছোট ব্যবসায়ীকে জানিয়ে দিই, যাতে সে সবার থেকে কম দামে দর দেয় এবং কাজ পায়। কাজ পাওয়ার পর সে খুশি হয়ে আমাকে কিছু টাকা উপহার দেয়। আমি অফিসের স্বার্থে ও কম দামে কাজ করাচ্ছি। জানাতে চাই, তার থেকে এভাবে টাকা নেওয়া আমার জন্য জায়েয হবে কি?

*মুহাম্মাদ *সুমন বাবু, কালশী, মিরপুর, ঢাকা- ১১।*
[শুধু মুহাম্মাদ নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : এভাবে অফিসের গোপন দরদামের তথ্য কাউকে জানিয়ে কাজ পাইয়ে দেওয়া এবং তার বিনিময়ে ব্যক্তিগত অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ এতে একাধিক গুনাহ রয়েছে। যেমন- আমানতের খেয়ানত, ঘুষ গ্রহণ এবং অপরের অধিকার হরণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সরকারী বা দায়িত্বশীল কর্মচারীদের দেওয়া উপহার অবৈধ আত্মসাৎ (চুরি) হিসাবে গণ্য হবে *(ছহীহুল জামে' হা/৭০২১)*। অতএব অফিসের গোপন দরদাম সংক্রান্ত তথ্য কাউকে জানিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা শরী'আতে হারাম। এটি ঘুষ, খেয়ানত ও অন্যের অধিকার নষ্ট করার শামিল।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : কোন কোন ব্যবসায়ী গরু ক্রয় করেন ১ মাস বা ২ মাস পালন করে আবার বিক্রি করেন, তারপর আবার কিছু গরু ক্রয় করেন। ফলে তাদের নিছাব পরিমাণ লাভের অর্থ বা গরু কোন সময়েই ১ বছর স্থিতি লাভ করে না। এমতাবস্থায় তারা যাকাত বের করবেন কিভাবে?

-মামূন, গাযীপুর।

উত্তর : এমতাবস্থায় কেবল বছর শেষে হিসাব করে মোট অর্থের উপর যাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ বছর শেষে ব্যবসায়ের গরুর বিক্রয় মূল্য হিসাব করে যদি নিছাব পরিমাণ হয় তাহ'লে তাকে যাকাত দিতে হবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৫/১২২)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : ঘরের পোকা-মাকড় মারার ক্ষেত্রে গরম পানি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি? এটা আগুনে পুড়িয়ে মারার শামিল হবে কি?

-রাফী, পঞ্চগড়।

উত্তর : গরম পানি আগুন নয়। এটি আগুনের মতো হুবহু শাস্তির মাধ্যমও নয়। বরং এটি একটি তরল উপাদান, যা সাধারণত পরিচ্ছন্নতা, জীবাণু ধ্বংস বা কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গরম পানি বা কীটনাশক দিয়ে পোকা মারলে আগুনে পোড়ানো বলা হয় না। বরং এটি পোকামাকড় ধ্বংস করার একটি প্রচলিত ও বৈধ উপায়। তাছাড়া দাঊদ (আঃ) একটি বৃক্ষের নীচে শুয়ে ছিলেন। একটি পিপীলিকায় তাকে কামড় দিলে তিনি গোটা পিপড়ার বাসাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন *(বুখারী হা/৩০১৯; মিশকাত হা/৪১২২)*।

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

মূলতঃ গণতন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন দেশেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নযীর পাওয়া যাবে না। এজন্য মিসরে ৯৯ শতাংশ এবং বাংলাদেশের ৯২ শতাংশ মানুষ ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের পক্ষে থাকলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন কখনই সম্ভব নয়।

সুতরাং প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা নয়, বরং ইমারত ও শূরা ভিত্তিক ইসলামী খেলাফতের রাষ্ট্রব্যবস্থাই কাম্য। সে পথেই আমরা সকল ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই। আমরা সকল ঈমানদার ভাই-বোনকে কুফরী তন্ত্র-মন্ত্রের পথ থেকে ফিরে এসে নবীদের তরীকায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাই। যার শুরুটা হবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার মাধ্যমে। যার বিজয় সূচিত হবে আদর্শিক মযবুতির মাধ্যমে। মিসরীয় বিদ্বান ক্বাযী হাসান আল-হুযায়বী (১৮৯১-১৯৭৩খৃ.) যথার্থই বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে'। অতএব আসুন এই আদর্শিক অস্থিরতার সময়ে আমরা দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকি। ফেৎনাপূর্ণ পথ ও মত থেকে নিজেদের হেফাযত করি। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার পথে নয়, বরং মানুষকে আদর্শের পথে আহ্বান করি। রাসূল (ছাঃ) ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে কালেমার দাওয়াত দেননি। বরং সেই দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরাই পরবর্তীকালে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে বসেন। আর এভাবেই দ্বীন কায়েম হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে খুশী তাকে ক্ষমতা দান করে থাকেন *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন *(স.স.)*।

বি. দ্র. এই লেখার মধ্যেই আমরা সংবাদ পেয়েছি রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল এণ্ড কলেজে ২১শে জুলাই সোমবার বেলা ১-টা ১৬ মিনিটে সেনাবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমানের আকস্মিক দুর্ঘটনায় কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরাসহ প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষের মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটেছে। আমরা তাদের মাগফিরাত ও শহীদী মৃত্যু কামনা করছি। তাদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে আহতদের আশু রোগমুক্তি কামনা করছি। আল্লাহুম্মা আমীন!

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ আগস্ট	০৬ ছফর	১৭ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:০৫	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	০৮ ছফর	১৯ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:০৭	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০২
০৫ আগস্ট	১০ ছফর	২১ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:০৮	০৫:৩০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
০৭ আগস্ট	১২ ছফর	২৩ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০৯	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	১৪ ছফর	২৫ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:১০	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৭:৫৭
১১ আগস্ট	১৬ ছফর	২৭ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:১২	০৫:৩৩	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৭:৫৫
১৩ আগস্ট	১৮ ছফর	২৯ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:১৩	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৭:৫৩
১৫ আগস্ট	২০ ছফর	৩১ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:১৪	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫২
১৭ আগস্ট	২২ ছফর	০২ ভাদ্র	রবিবার	০৪:১৫	০৫:৩৪	১২:০২	০৩:২৯	০৬:৩১	০৭:৫০
১৯ আগস্ট	২৪ ছফর	০৪ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:১৬	০৫:৩৫	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৪৮
২১ আগস্ট	২৬ ছফর	০৬ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:১৭	০৫:৩৬	১২:০১	০৩:২৯	০৬:২৭	০৭:৪৫
২৩ আগস্ট	২৮ ছফর	০৮ ভাদ্র	শনিবার	০৪:১৮	০৫:৩৮	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৬	০৭:৪৩
২৫ আগস্ট	০১ রবীঃ আউঃ	১০ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২০	০৫:৩৮	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪১
২৭ আগস্ট	০৩ রবীঃ আউঃ	১২ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২১	০৫:৩৯	১২:০০	০৩:২৭	০৬:২২	০৭:৩৯
২৯ আগস্ট	০৫ রবীঃ আউঃ	১৪ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২২	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:২০	০৭:৩৭
৩১ আগস্ট	০৭ রবীঃ আউঃ	১৬ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৩৫
০১ সেপ্টেম্বর	০৮ রবীঃ আউঃ	১৭ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	১০ রবীঃ আউঃ	১৯ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৪	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৩১
০৫ সেপ্টেম্বর	১২ রবীঃ আউঃ	২১ ভাদ	শুক্রবার	০৪:২৫	০৫:৪২	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:২৯
০৭ সেপ্টেম্বর	১৪ রবীঃ আউঃ	২৩ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	১৬ রবীঃ আউঃ	২৫ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৭	০৫:৪৩	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৯	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	১৮ রবীঃ আউঃ	২৭ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৭	০৫:৪৪	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:২২
১৩ সেপ্টেম্বর	২০ রবীঃ আউঃ	২৯ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৫	০৭:২০
১৫ সেপ্টেম্বর	২২ রবীঃ আউঃ	৩১ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৯	০৫:৪৫	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০৩	০৭:১৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	[redacted]				
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	+০	+০	+১	+০	+০
শরীয়তপুর	+১	+০	+০	+০	−১
নারায়ণগঞ্জ	+০	−১	+০	+০	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+২
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	+০	+০	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+২	+১
মুন্সিগঞ্জ	+০	−১	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৫	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	+০	+০	−১
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+২	+০
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−১	+১	+৪	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	−২	+০	+২	+১	+১
জামালপুর	+০	+২	+৪	+৪	+৪
নেত্রকোণা	−৩	−১	+১	+০	+১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৮	+৫	+৪	+৪	+৩
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+৩	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৪	+৩
খুলনা	+৫	+৩	+২	+৩	+১
বাগেরহাট	+৫	+২	+১	+১	+০
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৩	+১	−১	+০	−২
পটুয়াখালী	+৩	+০	−২	−১	−৩
পিরোজপুর	+৪	+২	+০	+১	−১
বরিশাল	+২	+০	−১	−১	−২
ভোলা	+১	−১	−৩	−২	−৪
বরগুনা	+৪	+১	−১	−১	−৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৪	+৪
পাবনা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৬	+৬	+৬
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৫	+৮	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০	+১০	+১০
নওগা	+৪	+৬	+৮	+৭	+৮

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+২	+৭	+১২	+১১	+১২
দিনাজপুর	+৩	+৭	+১১	+৯	+১০
লালমণিরহাট	−১	+৪	+৮	+৭	+৮
নীলফামারী	+২	+৬	+১০	+৯	+১০
গাইবান্ধা	+০	+৩	+৬	+৫	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৮	+১২	+১১	+১২
রংপুর	+১	+৪	+৮	+৮	+৮
কুড়িগ্রাম	−১	+৩	+৭	+৬	+৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৩	−৩	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৫	−৫	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−২	−৩
রাঙ্গামাটি	−৫	−৭	−৯	−৮	−১০
নোয়াখালী	−১	−৩	−৪	−৪	−৫
চাঁদপুর	+০	−১	−২	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	+০	−২	−৩	−৩	−৪
চট্টগ্রাম	−৩	−৬	−৮	−৭	−৯
কক্সবাজার	−২	−৬	−১০	−৯	−১১
খাগড়াছড়ি	−৫	−৬	−৭	−৭	−৮
বান্দরবান	−৪	−৭	−১০	−৯	−১১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৮	−৬	−৪	−৪	−৪
মৌলভীবাযার	−৭	−৬	−৪	−৪	−৫
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
সুনামগঞ্জ	−৭	−৪	−১	−২	−২

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

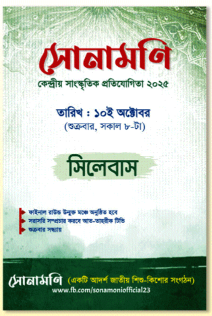

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫

অনুষ্ঠিত হবে ৪টি গ্রুপে

- ৭ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য
- ১১+ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য
- ৭ থেকে ১১ বছর কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য
- ১১+ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত কেবল জেনারেল শিক্ষার্থী বালকদের জন্য

বিষয়

আক্বীদা, অর্থসহ হিফযুল কুরআন, অর্থসহ হিফযুল হাদীছ, জাগরণী, সাধারণ জ্ঞান ও দ্বীনিয়াত

বিস্তারিত জানতে ও সিলেবাস সংগ্রহ করতে
০১৭১৫-৭১৫১৪৩ ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪

শুরু ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার (শাখা পর্যায়) ও শেষ ১০ই অক্টোবর শুক্রবার (কেন্দ্রীয় পর্যায়)

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 11, August 2025

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

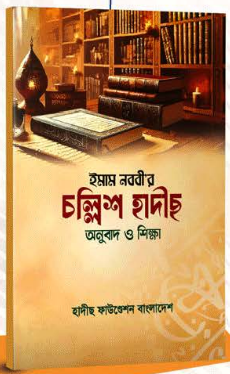

ইমাম নববী'র
চল্লিশ হাদীছ
অনুবাদ ও শিক্ষা

গবেষণা বিভাগ
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাওফীক্ব
লাভের উপায়

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

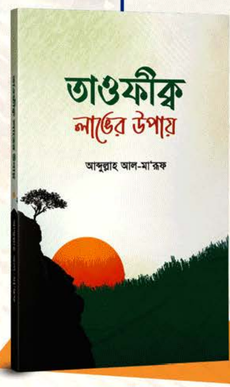

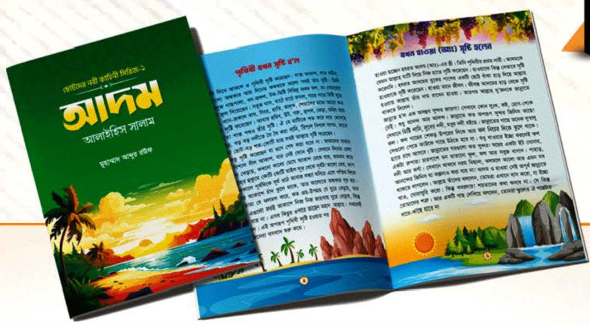

আদম
আলাইহিস সালাম

আমাদের কোমলমতি শিশুরা নবীগণের জীবনী পাঠ করে শৈশব থেকেই যেন তাঁদের আদর্শকে নিজেদের জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে রচনা করা হয়েছে **ছোটদের নবী কাহিনী সিরিজ**-এর প্রথম বই **আদম (আ.)**। এ সিরিজের বইগুলোতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে নবী-রাসূলগণের পরিচয় ও জীবনের নানা সংক্ষিপ্ত আকারে ঘটনাবলী আকর্ষণীয় ছাপা, রঙিন ছবি এবং সহজবোধ্য ভাষায় শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরা হয়েছে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

মীলাদ প্রসঙ্গ
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রচলিত 'মীলাদুন্নবী' অনুষ্ঠান ধর্মের নামে সৃষ্ট একটি বিদ'আতী রীতি মাত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বইটি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। সাথে এ সংক্রান্ত লিফলেটটিও পাঠ ও বিতরণ করতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার প্রচেষ্টায় একজন ব্যক্তিও যদি সঠিক পথে ফিরে আসে সেটিই আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চাইতে শ্রেষ্ঠতর হবে (বুখারী হা/২৯৪২)।

www.at-tahreek.com

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০